প্রেমেন্দ্র মিত্র



পাতালে পাঁচ বছর



পাতালে পাঁচ বছর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১
মে, ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫
নভেম্বর, ১৯৮৮

PATALE PANCH BACHAR Rs. 15
By Premendra Mitra
Dey's Publishing, 13 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-700073

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
পঞ্চানন জানা
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

দাম : ১৫ টাকা

পরম স্নেহের

সঞ্চিতা ও সন্দীপনকে

দাদু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই :

জুনিয়ার ঘনাদা



জাহাজডুবি আজকাল আখছার না হলেও মাঝে-মাঝে যে না হয় এমন নয়। এবং জাহাজডুবি হলে তন্ন-তন্ন করে তার সমস্ত বিবরণ, যারা মরল বাঁচল তাদের নাম-ধাম ইত্যাদি সবাই নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে পড়ে না ; এবং যা ও পড়ে তাও চিরদিন মনে করে রাখে না। সুতরাং ১৯২৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের কাছে 'এস্ এস্ ভাগীরথী' বলে যে মস্ত বড় চার হাজার টনের কয়লা-জাহাজটা তলিয়ে যায়, মানুষের স্মৃতিতেও তা আরও অনেক ব্যাপারের মত তলিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তবু যে তা যায় নি, তবু যে ভাগীরথী'র নাম করবামাত্র সবাই কান খাড়া করে আছে তার মস্ত কারণ আছে।

সত্যিই 'ভাগীরথী'র তলিয়ে যাওয়া একটু রহস্যজনক ব্যাপার। আরো রহস্যজনক আমাদের কাছে এইজন্যে যে, অত বড় জাহাজের সমস্ত মাঝি-মাল্লা, খালাসি, কর্মচারীর ভেতর শুধু দুজন বাঙালী ওয়্যারলেস অপারেটর ছাড়া আর সবাই উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে এসেছে।

জল ঝড় নেই, চোরা পাহাড় নেই, দিনের বেলা পুকুরের মত শান্ত জলে হঠাৎ কেমন করে 'ভাগীরথী' ডুবতে আরম্ভ করে সে বিবরণ কেউ-কেউ নিশ্চয় অনেকবার তখনকার খবরের কাগজে পড়েছে, না পড়ে থাকলে বড়দের কাছে শুনেছে নিশ্চয়ই—বেশি দিনের কথাও নয়, অনেকেরই সে কথা স্মরণ আছে।

বিপন্ন 'ভাগীরথী' জাহাজের বেতার-চিৎকার শুনে কেমন করে জাপানী জাহাজ 'কোমাগাতামারু' এসে সকলকে উদ্ধার করে, তাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। কিন্তু তোমরা কেন, পৃথিবীর কেউ যে কথা আজও জানে না এবং যে কথা বললেও পৃথিবীর লোকে বিশ্বাস করবে কি না আমি এখনও জানি না, সেই কথা আজ তোমাদের বলতে বসেছি।

একটা কথা বলে রাখা ভাল যে আমার এ কাহিনী আমি বড়-বড় সমস্ত কাগজের সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়েছিলুম কিন্তু কেউ এ কাহিনী ছাপাতে

রাজি হন নি। একজন সম্পাদক তো আমার মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে পাগলা-গারদে দেবেন বলেই শাসিয়েছিলেন। শুধু কি জানি কী ভেবে এ বইয়ের প্রকাশক মহাশয় এ কাহিনী ছাপাতে রাজি হয়েছেন। তাঁরও বোধ-হয় বিশ্বাস এটি গাঁজাখুরি গল্প মাত্র, তবে সাধারণের খারাপ নাও লাগতে পারে ভেবে বইয়ে স্থান দিয়েছেন।

কিন্তু এ কাহিনী বলতে গেলে আমায় শুরু করতে হবে দশ বছর আগে—অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকে, কারণ যে লোকটির সঙ্গে এই অদ্ভুত গল্প আগাগোড়া জড়িত তার একটু পরিচয় না দিলে এ কাহিনী সম্পূর্ণ হবে না।

দুই

শরতের সঙ্গে আলাপ আমার সেই ১৯১৩ সাল থেকে। সেই বছরই সে আমাদের ক্লাসে এসে ভর্তি হয়। তারপর স্কুলের সব-নিচু ক্লাস থেকে কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়ে এসেছি। কিন্তু আলাপ আর বন্ধুত্ব তো এক জিনিস নয়! তার সঙ্গে সত্যকার বন্ধুত্ব আমার হয় প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে উঠে। তার আগে সত্য কথা বলতে গেলে তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি জানতাম না। ক্লাসে সে বিশেষ ভাল ছেলে ছিল না। বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকলেও তার ভাবগতিক দেখে মনে হত পড়াশুনোয় তার বিশেষ মনোযোগ নেই। কোন রকমে পাশ করে যাওয়াই ছিল তার পক্ষে যথেষ্ট। মিশুক সে একদম ছিল না; কেমন একলা-একলা থাকাই ছিল তার অভ্যাস।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠে প্রথম যেদিন তাদের বাড়িতে যাই সেদিনকার কথা আমার বেশ ভাল মনে আছে। আমাদের স্কুলের সঙ্গে আর একটি স্কুলের সেদিন ফুটবল ম্যাচ ছিল। ম্যাচে আমরাই সেদিন জিতি। আমার খেলা নাকি সেদিন বেশ ভালই হয়েছিল। খেলা শেষ হবার পর আর সকলের সঙ্গে শরৎকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম একটু। শরৎ সাধারণত এ রকম উত্তেজিত হয় না। বাড়ি ফেরার পথে সে হঠাৎ নিজে থেকেই বললে, 'আমাদের বাড়ি চল্।' এ রকম অনুরোধ সে কখনও করেনি। মনে-মনে একটু বিস্মিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চললাম। সেইদিনই মনে আছে সে প্রথম আমার কাছে প্রাণ খুলে কথা বলেছিল। তার কথা শুনে সেদিন কী আনন্দই হয়েছিল বলতে পারি না। সেদিন টের পেয়ে-ছিলাম, আমারই মত তার মনের গতি অদ্ভুত। লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করতে তার ইচ্ছা নেই। যে-সব কাজ কেউ করে নি, যে-সব জায়গায় কেউ যায় নি—এমনি সব কাজ করা এমনি সব জায়গায় যাওয়া তার

সাধ। তার একমাত্র দুঃখ—স্বাস্থ্য ভাল হলেও আমার মত তার গায়ে জোর নেই। রাস্তায় যেতে যেতে সে এতবার আমার খেলা, আমার গায়ের জোরের প্রশংসা করেছিল যে আমি শেষে লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে বললে, আমার মত সঙ্গী পেলে সে না যেতে পারে এমন জায়গা নেই, না করতে পারে এমন কাজ নেই। মনের গতি একদিকে হওয়ায় সেইদিনই আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর শরতের বাড়ি গিয়ে তার পরিচয় আরো ভাল করে সেদিন পাই। তার ঘরটি একটি ছোট-খাট মিউজিয়াম আর ল্যাবরেটেরির সমন্বয়। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিশেষ কিছু আমার তখন জানা ছিল না। কিন্তু শরতের দেখলাম বিজ্ঞানের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বেশ ভালরকম জ্ঞান। নুড়ি-পাথর, নানা রকম শুকনো গাছ-পাতা, মরা পোকা-মাকড় থেকে টেস্ট টিউব, বুনসেন বার্নার প্রভৃতিতে তার ঘর বোঝাই। ক্লাসের পড়াশুনোয় কেন যে শরৎ খুব ভাল হয় না সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম।

তার পর থেকে প্রায় রোজই আমরা দুজনে তার ছোট ঘরটিতে এসে জুটতাম। শরৎ আমাকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত, কিন্তু আমার মনের গড়ন আলাদা। বিজ্ঞানে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি। দুজনের এ বিষয়ে তফাৎ থাকলেও একদিকে আমাদের মিল ছিল। সে হচ্ছে দেশ ভ্রমণের নেশা। কত অদ্ভুত অদ্ভুত দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যে আমরা দুজনে মিলে তখন পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

সেই ছোট্ট ঘরটিতে কতদিন বিকেল থেকে গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মানুষের পা কখনও পড়ে নি এমন দুর্গম জায়গায় যাবার কল্পনায় আমরা তখন বিভোর। হঠাৎ হয়ত শরতের মা এসে আমাদের চমকে দিয়ে বলেছেন, 'কিরে, অন্ধকারে ভূতের মত তোরা দুজনে বসে আছিস কেন? আলো জ্বালবি না?'

এমনি বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে আমরা কলেজে ঢুকলাম। শরৎ গিয়েছিল বিজ্ঞানের দিকে আর আমি আর্টসে। সুতরাং দেখাশুনো আমাদের এখন একটু কমই হত। কিন্তু আগেকার কথা আমরা ভুলি নি। দেখা হলে, কেমন করে আমাদের আশা পূর্ণ হতে পারে সেই আলোচনাই আমরা করতাম। কে জানত আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত শিগগির অমনভাবে পূর্ণ হবে।

তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা শরৎ হাঁফাতে হাঁফাতে আমার বাড়ি এসে হাজির। তার মুখ দেখেই বোঝা গেল কিসের

একটা উত্তেজনা সে যেন আর দমন করে রাখতে পারছে না। বললাম, 'ব্যাপার কি শরৎ?'

সে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'হয়ে গেছে ব্যবস্থা!'

অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের ব্যবস্থা?'

কিন্তু সে তখন নিজের আনন্দেই বিভোর—আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'আমি কিন্তু বাড়িতে কিছু বলি নি, তুই বলবি নাকি?'

আমি হেসে বললাম, 'আরে, ব্যাপারটা কী তাই আগে শুনি!'

এতক্ষণে শরতের হুঁস হল বোধহয়। বললে 'ও, তা বুঝি বলতে ভুলে গেছি,—আমরা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি যে!'

'অস্ট্রেলিয়া!'

শরৎ আমার বিস্ময়ে যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'হ্যাঁ রে, ওয়্যারলেস অপারেটর হয়ে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিস নি?'

তবু ব্যাপারটা সরল হল না। কিন্তু এই উত্তেজিত অবস্থায় শরতের কাছ থেকে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব বুঝে তখনকার মত আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। খানিক বাদে অবশ্য তার কথা থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

খবরের কাগজে ওয়্যারলেস অপারেটর চাই বলে বিজ্ঞাপন দেখে সে আমার ও তার নিজের নামে কয়েকদিন আগে দুটো দরখাস্ত করে দিয়েছিল। সে দরখাস্তের উত্তর এসে গেছে। আমাদের সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

সামান্য দরখাস্তের উত্তর আসা থেকে একেবারে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া একটু বাড়াবাড়ি কল্পনা মনে হলেও সেদিন শরৎকে তা বলি নি; এবং না বলে ভালই করেছিলাম।

কারণ সত্যাই অসম্ভব একদিন সম্ভব হয়ে গেল। গোপনে গোপনে ওয়্যারলেস অপারেটরের কাজ শিখে একদিন সত্যাই আমরা এক কয়লা-জাহাজের কাজে বহাল হলাম এবং সে কয়লা-জাহাজ সত্যাই অস্ট্রেলিয়ার যাত্রী।

তিন

খিদিরপুরের ডক থেকে জাহাজ যেদিন ছাড়ল, আমাদের সেদিনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা শক্ত। একদিকে নতুন দেশ দেখার আশা উৎসাহ, আর একদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও স্বদেশ ছেড়ে যাবার গভীর দুঃখ। আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি নিয়ে সকলকে জানিয়ে এলে দুঃখ এতটা হত কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমরা একেবারে সকলকে লুকিয়ে এসেছিলাম। কী ভাগ্যি, আমাদের দুজনের এক জাহাজেই চাকরি মিলেছিল; তা না হলে দেশ-

ভ্রমণের উৎসাহ ছাপিয়ে দেশ ছেড়ে যাবার দুঃখ বোধহয় সেদিন দুঃসহ হয়ে উঠত।

দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজ মাঝ-গঙ্গায় এসে সবেগে চলতে আরম্ভ করল। অনেকক্ষণ আমরা দুজনে বাইরের ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর যখন নিজেদের কেবিনে ফিরলাম তখন দুজনেরই চোখে জল এসেছে।

আমাদের জাহাজ ছমাসের মধ্যে যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ঘুরে অস্ট্রেলিয়া চলে আনবে আমরা জানতাম। এই ছ-মাস দেশের মাটি দেখতে পাব না ভেবে সেদিন অত উৎসাহের ভেতরও কষ্ট হয়েছিল। এখন ভাবি যে আমাদের ভাগ্যদেবতা সেদিন আমাদের সে চোখের জল দেখে বোধহয় হেসেছিলেন।

আমরা যে জাহাজে কাজ পেয়েছিলাম কয়লা বয়ে বেড়ানোই তার কাজ। সুতরাং যাত্রী-টাত্রী তাতে বড় একটা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেবার একজন যাত্রী জুটে গিয়েছিলেন। কয়লা-জাহাজের দিনগুলো যেরকম একঘেয়ে তাতে তাঁর মত লোকের সঙ্গ না পেলে সেবার আমাদের বেশ কষ্টই হত। জাহাজে চড়ে বেড়ানোর উত্তেজনা দিন-পাঁচকের মধ্যেই কেটে যায়—তারপর দিন-রাত সেই এক আকাশ আর জল—কোন বৈচিত্র্য নেই। মিঃ বেনসনের সাহচর্য পেয়ে কিন্তু এই একঘেয়ে আকাশ ও জলও আমাদের কাছে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। মিঃ বেনসন সিডনির এক কলেজের অধ্যাপক। আমাদের জাহাজের মালিক তাঁর বন্ধু। মিঃ বেনসন প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতেন। কোথায় সমুদ্র কত গভীর, কোথায় কী কী সামুদ্রিক প্রাণী পাওয়া যায়, সমুদ্রের স্রোত কোথায় কী ভাবে গেছে ইত্যাদি খবর তাঁর কাছে শুনতে শুনতে আমাদের যাত্রার একঘেয়েমিটা আমরা টেরই পেতাম না। মিঃ বেনসনের সঙ্গে আলাপের সময় দেখতাম, শরৎ ও প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে নেহাৎ কম জানে না।

জাভা সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের বন্দরগুলি একবার করে ছুঁয়ে একদিন অস্ট্রেলিয়ার দিকে আমাদের জাহাজ চলতে শুরু করল। মিঃ বেনসনের কাছে সেদিন শুনলাম, দীর্ঘ একমাসের মধ্যে কোন বন্দরে আর আমাদের জাহাজ থামবে না। যেখান দিয়ে আমাদের জাহাজ যাচ্ছিল সেখানকার সমুদ্র সম্বন্ধে মিঃ বেনসন সেদিন অনেক অদ্ভুত কথা বলেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কটি জায়গা এত গভীর যে তার তলা পাওয়া যায় না বললেই হয়—এই জায়গা তাদের মধ্যে একটি। এই জায়গা সম্বন্ধে আরো একটি অদ্ভুত কাহিনী তিনি বলেছিলেন। বছর দশেক আগে একটি

ব্রিটিশ রণপোতের নাবিকেরা সেখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখে। তখন জার্মানির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে গমের জাহাজ আটলান্টিক দিয়ে পাঠালে প্রায়ই জার্মানদের হাতে পড়ে মারা যায় বলে অনেক দেরি হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারত মহাসাগর দিয়ে ভারতবর্ষ হয়ে কয়েকটি জাহাজ সম্প্রতি যাচ্ছিল। এই রণপোতটির কাজ ছিল তাদের পাহারা দেওয়া। একদিন দুপুরবেলা এইখান দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রণপোত থেকে দেখা যায় —দূরে গম্বুজের মত কয়েকটা প্রকাণ্ড কি জিনিস জলের ওপর ভাসছে। যুদ্ধ জাহাজের নাবিকেরা প্রথমে সেটাকে জার্মানদের তৈরি নতুন কোনরকম সাবমেরিনের পেরিস্কোপ ভেবেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাদের সে ভুল ভেঙে গেল। জার্মান সাবমেরিন হলে ব্রিটিশ রণপোত দেখবার পর এতক্ষণ জলের ওপর কিছুতেই ভেসে থাকত না। অথচ এগুলি ভেসে তো রইলই, বরং মনে হল ক্রমশ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। গম্বুজগুলির আকারও অদ্ভুত ; মাথার দিকে ক্রমশ সেগুলি শূলের মত সরু হয়ে উঠেছে। রণপোতের নাবিকেরা কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে একটি গম্বুজ হঠাৎ ডুবে গেল। কোনপ্রকার অজানা সামুদ্রিক প্রাণী হতে পারে ভেবে জাহাজের কাপ্তেন তখন একটিকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণীই হোক বা আর যাই হোক, গম্বুজাকৃতি পদার্থটির তাঁর অব্যর্থ গুলিতেও কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না। কাপ্তেন তখন ব্যাপারটা ভালো করে দেখবার জন্যে একটি বোট নামাতে বললেন,—বোট নামানোও হল, কিন্তু গম্বুজগুলির কাছে যাবার আগে হঠাৎ সেগুলি এক-এক করে ডুবে গেল। যেখানে সেগুলি ভাসছিল বোট নিয়ে সেখানে তারপর কাপ্তেন গিয়ে অনেক খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গুলিতে আহত সামুদ্রিক প্রাণীর একটু রক্তের চিহ্নও জলের ওপর পান নি।

যুদ্ধের ভেতরই এক সময়ে বিলেতে ফিরে সেই জাহাজের কাপ্তেন এ সম্বন্ধে কোন কাগজে লিখেছিলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধের ব্যাপারেই সমস্ত লোক ব্যস্ত। তাঁর এ কাহিনী নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নি।

মিঃ বেনসনকে বিশ্বাস করলেও তাঁর এ কাহিনী শুনে সেদিন বিশ্বাস করিনি। জাহাজের নাবিকেরা তিলকে তাল করে আজগুবি গল্প বানাতে যে সিদ্ধহস্ত—যে-কোন দেশের সাহিত্য খুঁজলেই তার প্রমাণের অভাব হবে না। মিঃ বেনসনকে তাই বলতে তিনি কিন্তু কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন, 'অবিশ্বাস করবার আমি তো কিছু দেখি না। সমুদ্রের রহস্যের আমরা কতটুকুই বা জানি ?'

মাত্র আধঘণ্টা বাদে তাঁর কথা আমাদের জীবনেই অমনভাবে ফলবে কে জানত !

চার

সেদিন বিকেলে বেতার-ঘরে হাজিরা দেবার পালা ছিল আমার। বেতার-ঘরের কাজ শুনতে খুব বড়গোছের হলেও আসলে বিশেষ কিছু নয়। আমাদের সাধারণত দুকানে একটি যন্ত্র বেঁধে বসে থাকা ছাড়া কিছু করতে হত না। তখন সবে নানা দেশে বেতারে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূর দেশের গান-বাজনা কানে আসত এবং সবশুদ্ধ জড়িয়ে সময়টা নেহাৎ মন্দ কাটত না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে সেদিনও কানে হেডপিস লাগিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বসে-ছিলাম। জাহাজে ওঠার পর উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ বেতারে এসেছে বলে মনে পড়ে না, এবং আমাদেরও কোনদিন কোন জরুরী খবর কোথাও পাঠাতে হয় নি। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাটা একরকম তাই অভ্যাস হয়ে গেছল।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করা সেদিন আমার ভাগ্যে নেই। হঠাৎ পায়ের তলায় সমস্ত জাহাজটা কিসের আঘাতে যেন থর-থর করে কেঁপে উঠল। অত্যন্ত শান্ত সমুদ্রেও ইঞ্জিন প্রবল বেগে চলার ফলে একটা কাঁপুনি সব সময়েই জাহাজে অনুভব করা যায়। কিন্তু এ সে কাঁপুনি নয়। ঠিক মনে হল জাহাজের তলাতে কী যেন একটা জিনিস হঠাৎ ঢুঁ মেরেছে। খানিক আগেই মিঃ বেনসনের কাছে শুনেছি যে এখানটা ভারত সাগর শুধু নয়, প্রশান্ত মহাসাগরেরও সবচেয়ে গভীর জায়গা—চোরা পাহাড় বা সেই জাতীয় কিছুর অস্তিত্বই এখানে নেই। তাহলে ?

কিন্তু প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হঠাৎ আর-একটা ধাক্কায় জাহাজটা যেন জীবন্ত প্রাণীর মত কাৎরে ছটফট করে উঠল। কি একটা অজানা ভয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু করবার কী আছে ? বেতারে-ঘরের আশে-পাশে এমন কেউ নেই যে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায়। অথচ বেতার-ঘর ছেড়ে যাবারও উপায় নেই। দূরে জাহাজের নানা জায়গায় একটা হট্টগোল চলেছে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে মাথা থেকে হেডপিস খুলেও, সেটা যে কী নিয়ে তা নির্ণয় করতে পারলাম না।

কী করব ভাবছি, এমন সময় জাহাজের সেকেণ্ড মেট আলুথালুভাবে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, ‘সর্বনাশ হয়েছে, শিগগির তার করুন!’ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছে তা তিনি মুখে বলবার আগেই তাঁর চেহারা দেখে আমি অনুমান করেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কী তার করতে হবে ?’

তিনি একটা চেয়ার টেনে হতাশভাবে ইতিমধ্যে বসে পড়েছিলেন, আমার প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, 'যাঃ, আজকের চার্টটা দেখে আসতেই ভুলে গেছি। দাঁড়ান দেখে আসি!'

তাঁকে হাত ধরে থামিয়ে বললাম, 'আজকের জাহাজের অবস্থান আমি খানিক আগে দেখে এসেছি, জাহাজ সম্বন্ধে কী তার করব তাই বলুন।'

তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি চার্ট দেখে এসেছেন? তাহলে আর কী!—এত লন্‌জিচিউড এত ল্যাটিচিউড "এস্ এস্ ভাগীরথী" ডুবছে, সাহায্য চাই। শুধু এইটুকুই তার করুন।'

বেতার-যন্ত্রে সেই ভয়ঙ্কর খবরটুকু চারিধারে পাঠিয়ে দেবার সময় হাত-পা কাঁপলেও বুকের ভেতরটা যে কেঁপে ওঠে নি—এমন কথা বলতে পারব না। যে জাহাজে এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বাড়ির মত আয়েসে কাটিয়েছি সে জাহাজ যে হঠাৎ ডুবতে পারে এ কথা প্রথমটা উপলব্ধি করা অবশ্য সহজ নয়। কিন্তু ক্রমশ চারিধারের হট্টগোল, খালাসি ও অন্যান্য কর্মচারীদের উন্মত্ত ব্যস্ততা প্রভৃতি থেকে যখন বুঝতে পারলাম এই দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মাঝখানে সত্যিই আমাদের জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে, তখন বেতার-যন্ত্রের ধারে স্থির হয়ে বসে থাকা যে কী ভয়ানক কষ্টকর হয়ে উঠল তা বলে বোঝাতে পারা যাবে না। সমুদ্রের জীবনে অনভ্যস্ত বলে একা আমিই যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, দেখলাম—সেকেণ্ড মেটের মুখও সাদা হয়ে গেছে—আতঙ্কে।

ভীত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন জাহাজ থেকে ছাড়া পেলেন?'

বেতার যন্ত্রে সাহায্যের জন্যে তখন আমি সমানভাবে তার করে চলেছি। বললাম, 'না'।

সেকেণ্ড মেট অস্থিরভাবে নিজের চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, 'এ পোড়া সমুদ্রে আমাদের মত হতভাগাদের ছাড়া আর কারো জাহাজ কি আসে কখনো, যে সাড়া পাবেন! আমাদের আর উদ্ধার নেই!'

নিজের মনে যেটুকু সাহসও বা ছিল সেকেণ্ড মেটের এই কাতরতা দেখে তাও তখন উড়ে গেছে। সমুদ্রে নাবিকদের অসহায়ভাবে ডুবে মরার মত লোমহর্ষণ গল্প পড়েছি সমস্ত তখন মাথার ভেতর এক-এক করে বায়োস্কোপের ছবির মত ভেসে উঠছিল। কেন শরতের কথায় ওয়্যারলেস অপারেটরের চাকরি নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম ভেবে একটু আফশোসও যে না হচ্ছিল তা নয়।

সেকেণ্ড মেট অর্ধোন্মাদের মত তখন তাঁর দেশের, সংসারের কথা নিজের মনে বকে যাচ্ছিলেন। আসবার সময় তাঁর ছোট মেয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে

বলেছিল, 'বাবা তুমি যেও না!' তাঁর স্ত্রী আগের রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সকালে তাঁকে এ জাহাজে কাজ নিতে মানা করেছিলেন। হয়তো তারা ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত কোন রকমে পেয়ে থাকবে! কেন তিনি তাদের কথা শোনেন নি! আর তাদের সঙ্গে জীবনে হয়তো দেখা হবে না…'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'চুপ করুন মিঃ জোন্স, বোধহয়…'

মিঃ জোন্স চমকে উঠে খানিক চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললেন, 'সাড়া পেলেন নাকি কোথাও থেকে?'

প্রথমটা আমার সেইরকমই মনে হয়েছিল কিন্তু শেষে দেখলাম, একটা সাধারণ জাহাজের বেতার-সংবাদ। হতাশভাবে বললাম, 'না।'

মিঃ জোন্সের মুখখানা খানিক আগে আশায় একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আমার কথায় আবার তা অন্ধকার হয়ে গেল।

এবার জাহাজের ডেক থেকে বিপদের ঘণ্টা শোনা গেল। বুঝলাম, জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাইফ-বোট নামানো হয়েছে। এ জাহাজের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। মিঃ জোন্স আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'চলে আসুন! আর তার করে লাভ নেই।'

সেই মুহূর্তে বেতার যন্ত্র বেজে উঠল। হাতের ইঙ্গিতে মিঃ জোন্সকে চুপ করতে বলে কাগজ টেনে নিয়ে সংবাদটা লিখতে আরম্ভ করলাম। এতক্ষণ যে গভীর হতাশায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছল, লিখতে লিখতে তা যে কেমন করে দূর হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না। মানুষের মন এমনি।

মিঃ জোন্স আমার কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখি দেখছিলেন। অস্ফুট আনন্দ-ধ্বনি করে তিনি বলে উঠলেন, কোমাগাতামারু—জাপানী জাহাজ—মাত্র পনেরো মাইল দূরে! যাক, বোধহয় এ-যাত্রা আমরা রক্ষা পেলাম!'

ডেকে তখনও বিপদের ঘণ্টা বাজছে। মিঃ জোন্স আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চলুন শিগগির! সবাই এতক্ষণ বোটে উঠে পড়েছে।'

কিন্তু দেখা গেল—তাঁর অনুমান ভুল। খানিক দূর যেতেই স্বয়ং কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের দিকেই আসছিলেন। এই ভয়ঙ্কর বিপদের ভেতর তাঁর সে ধীর, গম্ভীর, অবিচলিত মুখ দেখে সত্যিই সেদিন শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। মিঃ জোন্সের উত্তেজনার সঙ্গে তুলনা করে কাপ্তেনের এই ধৈর্য আরো অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

শান্তভাবে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেতারে কোন সংবাদ পাওয়া গেল?'

আমি আমার কাগজখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম' 'পাওয়া গেছে।'

কাপ্তেন কাগজখানা পড়ে বললেন, 'তোমরা লাইফবোটে ওঠ গিয়ে, আমি আসছি।' এত বড় একটা আনন্দের সংবাদেও সামান্য একটু পরিবর্তনও তাঁর মুখে দেখতে পেলাম না। জাহাজ ডোবা যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যেমন সহজভাবে তিনি জাহাজের প্রত্যেক দিনের গতি নির্দেশ করেন, তেমনিভাবেই আমাদের আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ জোন্সের সঙ্গে ডেকে নেমে এসে চারিধারের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের জলের রঙ গাঢ় হয়ে এসেছে, কিন্তু তা পুকুরের মত স্থির। এই পর্যন্ত সমুদ্রের মাঝে আমাদের জাহাজ যে ডুবছে, এ কথা বিশ্বাস করাই কঠিন। দুটি লাইফ-বোট নিচে নামানো হয়েছে। অধিকাংশ নাবিকই ইতিমধ্যে বুকে লাইফ-বেল্ট বেঁধে তাতে গিয়ে উঠেছে। একটি করে লাইফ-বেল্ট নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমরাও নিচে নেমে বোটে গিয়ে বসলাম।

হঠাৎ দেখা গেল, জাহাজের সর্বোচ্চ মাস্তুলে কাপ্তেন সাহেব তাঁর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। এই বিপদের মুহূর্তেও এই সামান্য কর্তব্যটুকু তিনি ভোলেন নি।

খানিক বাদেই কাপ্তেন সাহেব নেমে এলেন। ইদু নৌকোয় সবাই ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছি। কাপ্তেন উঠতেই দাঁড় দিয়ে জাহাজের গায়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল।

সেই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ায় হঠাৎ চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, আমাদের দু-বোটের একটিতেও শরৎ নেই।

পাঁচ

নিমজ্জমান জাহাজ থেকে যত দূর সম্ভব সরে যাবার জন্যে নাবিকেরা তখন প্রাণপণে দাঁড় চালাচ্ছে। জাহাজ ডোবার সময় জলে যে ভয়ঙ্কর আলোড়ন হয়, তার মধ্যে পড়লে এদুটি নৌকো যে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যাবে, এ কথা তারা সবাই জানে। নৌকোদুটি তখনো পাশাপাশি যাচ্ছিল। আমার দেখার ভুল হয়েছে মনে করে তন্ন-তন্ন করে সকলের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম, সত্যিই শরৎ নেই। কোথায় গেল শরৎ? যে কারণেই হোক, এখনো সে ঐ ডুবন্ত জাহাজে পড়ে আছে মনে করতেই আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। পাগলের মত দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললাম, 'শিগগির নৌকো ফেরাও, একজন এখনো জাহাজে রয়ে গেছে!' আমার এই

আকস্মিক ব্যবহারে সবাই খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে গেল। আমি উত্তেজিত-ভাবে বললাম, 'আমাদের আর-একজন অপারেটর, শরৎ—মিঃ বোস যে জাহাজে আটকে আছে!'

নাবিকেরা কী করবে না বুঝতে পেরে ইতস্তত করছিল। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আর উপায় নেই, জাহাজ ডুবছে।' সত্যিই তখন ডেকের ধার পর্যন্ত সমুদ্রের জল গিয়ে পৌঁছেছে।

তবু আমি কাতরভাবে মিনতি করে বললাম, 'কিন্তু আমাদের একজনকে এরকমভাবে আমরা ফেলে চলে যাব কেমন করে? দোহাই আপনার! একটিবার নৌকো ফেরাবার আদেশ দিন!

আমার দিকে চেয়ে তেমনি শান্তভাবে কাপ্তেন বললেন, 'তা হয় না, মিঃ দে, একজনের জন্যে এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন করা অন্যায়।' তারপর যারা দাঁড় টানছিল তাদের দিকে ফিরে তিনি নৌকো চালাতে আদেশ দিলেন।

সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে কাপ্তেন সাহেব অন্যায় কিছু বলেছিলেন তা মনে হয় না, কিন্তু তখন শরৎ অসহায়ভাবে নিমজ্জমান জাহাজের ভেতর বন্দী হয়ে আছে জেনে আমার মাথার কোন ঠিক ছিল না। হতাশায় রাগে অন্ধ হয়ে আমি চিৎকার করে বললাম, 'কাপুরুষের দল, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোই তোমাদের কাছে সব! তোমাদের কারুর সাহায্য চাই না!'

সঙ্গে সঙ্গে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাপ্তেন সাহেব হাত বাড়িয়ে আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। জলে পড়ে আমি জাহাজের দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতরাতে লাগলাম। পেছন থেকে কাপ্তেন সাহেব আমার এ চেষ্টা গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছু নয় এবং নিষ্ফল হতে বাধ্য জানিয়ে আমায় ফিরতে অনুরোধ করছেন শুনতে পেলাম, কিন্তু তখন আমার কোনদিকে চাইবার অবসর নেই। আমার সঙ্কল্প আমি মনে মনে তখন স্থির করে ফেলেছি। শরৎকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করলেও আমাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া যে অসম্ভব, একথা তখন আমি যে একেবারে বুঝি নি তা নয়। জাহাজ ডোবার আগে সেখানে পৌঁছোতে পারব কি না সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু শরৎকে উদ্ধার করবার নিষ্ফল চেষ্টা করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। শরৎ জাহাজের সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে জেনে আর পক্ষে নিশ্চেষ্টভাবে নিজের প্রাণের ভয়ে বসে থাকা অসম্ভব। দুজনে আমরা একসঙ্গে জাহাজের কাজে ঢুকেছিলাম, আজ যদি মরতে হয় দুজনে একসঙ্গেই মরব।

মরিয়া হয়ে আমি জাহাজের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। কাপ্তেন সাহেব আমার ফেরার জন্যে কতক্ষণ নৌকো থামিয়ে অপেক্ষা করছিলেন জানি না, কিন্তু খানিক বাদে মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে দেখলাম, আসন্ন অন্ধকারে নৌকোদুটি বহু দূরে ছায়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

জাহাজে যখন গিয়ে উঠলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জনহীন, পরিত্যক্ত বিশাল জাহাজটা সেই অন্ধকারের ভেতর ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের জল তখন তার প্রায় কানায় কানায় উঠেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

চিৎকার করে ডাকলাম, 'শরৎ!' নিস্তব্ধ অন্ধকারে, বিশাল সাগরের মাঝে, সেই নিমজ্জমান জাহাজের ওপর আমার সে স্বর আমার কানেই এমন অদ্ভুত শোনালো যে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু কোথায় শরৎ! মৃত্যুর আগে খাবি খাবার মত সমস্ত জাহাজটা তখন থেকে-থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে কাঁপুনি যেন আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে বুকের ভেতর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে মনে হচ্ছিল। যে-কেবিনে আমরা দুজনে থাকতাম সেখানে ছুটে গিয়ে তাক থেকে একটা দেশলাই পেড়ে জ্বাললাম। নাঃ, সেখানে কেউ নেই। কিন্তু কোথায় তাহলে শরৎ থাকতে পারে? কয়েক ঘণ্টা আগে বেতার-ঘরে যাবার সময় যাকে সুস্থ সবল দেখে গেছি, জাহাজের এত বড় দুর্ঘটনার সময় কী কারণে তাকে দেখতে পাওয়া যায় নি? এ রহস্যের কোন কূল-কিনারাই আমি করতে পারলাম না। আর যদি-বা তখন কোন কারণে লাইফ-বোটে তার ওঠা সম্ভব না হয়ে থাকে, এখন এই পরিত্যক্ত জাহাজে তার কোন সাড়া না পাবার কী কারণ থাকতে পারে? তাহলে শরৎ কি জাহাজেই নেই! ভয়ে দুর্ভাবনায়, হতাশায় আমার সমস্ত শরীর মনে হল অবশ হয়ে আসছে।

জাহাজের নিচের কামরাগুলি ইতিমধ্যেই জলে ডুবে গেছে। সেখানে সন্ধান করা মানুষের অসাধ্য। পাগলের মত ডেকের চারিধারে ঘুরতে-ঘুরতে আমি আর-একবার শরতের নাম ধরে ডাকলাম।

এবং পরমুহূর্তেই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জাহাজের রান্নাঘরের দিক থেকে ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন উত্তর দিয়েছে মনে হল। আর-একবার তার সাড়া পেতেই ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

ছয়

কয়েক মিনিট বাদেই শরৎকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এসে যখন অন্ধকার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখনও তার আচ্ছন্ন ভাব কাটে নি।

মাথার ক্ষত থেকে তখনও বোধ হয় তার রক্ত পড়ছিল। শরৎ আমার ব্যবহারে অবাক এবং একটু বিরক্তই হয়ে বললে, 'এ কী পাগলামি করছিস?'

'কথা বলবার সময় নেই শরৎ! যদি কোন রকমে এ-যাত্রা রক্ষা পাই, তাহলে সব কথা বুঝিয়ে বলব; এখন প্রাণপণে সাঁতার কাট!'

ঠাণ্ডা জলে পড়ে শরতের আচ্ছন্ন ভাবটা ক্রমশ কেটে আসছিল বোধহয়; কিছু না বুঝতে পারলেও. আমার সঙ্গে প্রাণপণে সে সাঁতার কাটতে লাগল। সেই সময়ে আমার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চেয়ে শরৎ জোর-জবরদস্তি করলে আর আমাদের উপায় ছিল না, কারণ শ-খানেক হাত সাঁতরে যেতে-না-যেতেই আমাদের পেছনে জাহাজটা সমুদ্রের জলে যে বিপুল আলোড়ন তুলে ডুবে গেল, তারই বেগ সামলাতে আমাদের প্রায় প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। শরতের সঙ্গে বচসায় আর এক মুহূর্ত দেরী হলেই সে-যাত্রা জাহাজের সঙ্গেই আমাদের সলিল-সমাধি হত।

অবশ্য জাহাজের সঙ্গে সহমরণে যাবার দুর্ভাগ্য থেকে রেহাই পেলেও আমাদের আশা করবার বিশেষ কিছু ছিল না। অন্ধকারে তখন সমুদ্র আর আকাশ একাকার হয়ে গেছে। আমাদের জাহাজের লাইফ-বোট দুটি তখন যে কত দূর চলে গেছে কে জানে, আর অত্যন্ত কাছে থাকলেও এই অন্ধকারে তারা আমাদের কোন সাহায্যেই লাগত না। এখন যতক্ষণ পারা যায় জলে ভেসে থাকাই আমাদের একমাত্র কাজ. কিন্তু এই অকূল সমুদ্রে হাজার ভাল সাঁতার জানলেও কতক্ষণ আর তা সম্ভব?

শরৎ কিন্তু এসব কথা ভাবছিল না। জাহাজ ডোবার রহস্যটা তার কাছে পরিষ্কার না হওয়ায় তার বোধহয় অস্বস্তি হচ্ছিল। তার প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত ঘটনা তাকে সংক্ষেপে জানালাম। কেন যে লাইফ-বোটে সে উঠতে পারে নি, সে রহস্যেরও তার কথায় মীমাংসা হয়ে গেল। শরতের কথায় জানলাম যে মিঃ বেনসনের ঘর থেকে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সে নিজের কেবিনে ফিরছিল, এমন সময় জাহাজটা দুলে ওঠে এবং পরমুহূর্তেই তার মাথার ওপরকার একটা কাঠের শেল্ফ্ কিরকমভাবে আলগা হয়ে তার মাথার ওপর পড়ে যায়। তারপর আমার ডাক শোনার আগে পর্যন্ত তার আর কোন জ্ঞান ছিল না। ইতিমধ্যে কী যে হয়েছে কিছুই সে জানে না।

শরতের কথা শেষ হতে-না-হতেই আমি নিজের অজ্ঞাতে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম। শরৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী?'

কিন্তু সে প্রশ্নের আর উত্তর দেবার দরকার হল না। দূরের একটা জাহাজের প্রখর সার্চ-লাইট তখন সমুদ্রের চারধারে কি যেন খুঁজে ফিরছে।

যে জাহাজ থেকে আমরা বেতারে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছিলাম এ যে সেই জাপানী জাহাজ কোমাগাতামারু এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমাদের লাইফ-বোট দুটি কোথায়?

হঠাৎ শরৎ বলে উঠল, 'ঐ তো আমাদের লাইফ বোট।'

দেখা গেল কোমাগাতামারুর সার্চ-লাইট সমুদ্রের ওপর অশান্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেছে। তার প্রখর আলোতে আমাদের লাইফ-বোট-দুটি এবার আমরা দেখতে পেলাম। আমরা যেখানে ছিলাম তা থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে নৌকোদুটি ভাসছিল। নৌকোর ওপর আমাদের নাবিকেরা উদ্ধার পাবার আনন্দে কি একটা জিনিস পতাকার মত ওড়াচ্ছে দেখতে পেলাম।

সার্চ-লাইটের আলো লাইফ-বোট-দুটির ওপর নিবদ্ধ রেখে জাপানী জাহাজটি ক্রমশ তাদের দিকে এবার এগিয়ে আসছিল।

শরৎকে এবার আর কিছু বলতে হল না। শেষ আশায় ভর করে প্রাণপণে আমরা লাইফ-বোট-দুটির দিকে লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে লাগলাম। এখনও সময়-মত পৌঁছোতে পারলে হয়ত আমরা উদ্ধার পেতে পারি।

কিন্তু ভাগ্য আমাদের প্রতি বিরূপ। শরৎ একেই তেমন সবল নয়, তার ওপর মাথায় ঘা খেয়ে রক্তপাত হওয়ার দরুন তার শরীরে আর বিশেষ শক্তি ছিল না। খানিক দূর যেতে-না-যেতেই সে ক্রমশ পেছিয়ে পড়তে লাগল এবং খানিক বাদে হতাশভাবে বললে, 'তুমি একলা যাও ভাই, আমি আর পারব না।' তাড়াতাড়ি পেছু ফিরে তাকে ধরে ফেললাম, কিন্তু আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে যেতে তাকে কোনমতেই রাজি করাতে পারলাম না। সে বার-বার আমায় একলা যেতে অনুরোধ করে বলতে লাগল, 'এভাবে দুজনে মরে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে তুমি একলা গেলে বোধহয় পৌঁছোতে পারবে। আমার সত্যকার অনুরোধ—তুমি যাও।'

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের ওপর দিয়ে কোমাগাতামারু দুটি লাইফ-বোটের সমস্ত নাবিকদের তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। যাবার আগে শেষবার তার সার্চ-লাইটটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন বুলিয়ে নিয়ে গেল।

শরৎ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। কোমাগাতামারু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশা নির্মূল হওয়ায় আমারও যেন শরীরে আর কোন জোর ছিল না। লাইফ-বেল্ট বুকে বাঁধা না থাকলে এই অবস্থায় শরৎকে

ভাসিয়ে রাখা দুষ্কর হত। লাইফ-বেল্ট থাকা সত্ত্বেও সে যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে মনে হচ্ছিল।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে ঠিক বলতে পারি না, হঠাৎ পেছনে জলের একরকম শব্দ শুনে চমকে গেলাম। আমাদের ত্রিসীমানায় জাহাজ বা নৌকো কোন কিছু নেই। তাহলে নৌকোর তলায় জলের ঢেউ লাগবার মত এ শব্দ কোথা থেকে আসছে! পেছন ফিরে অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু খানিক বাদে কয়েক হাত দূরে যে জিনিসটি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল তা দেখে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বিশাল ডেকচির মত একটা জিনিস আমাদের অত্যন্ত কাছে জলের ওপর ভাসছে। জলের ঢেউ তারই তলায় গিয়ে আঘাত করায় ঠিক নৌকোর মত শব্দ হচ্ছিল।

শরৎও জিনিসটা দেখতে পেয়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী বল তো?'

বললাম, 'বুঝতে তো পারছি না। দাঁড়াও দেখি।'

একটুখানি সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা এবার ভাল করে দেখতে পেলাম। ডেকচির সঙ্গে চেহারায় তার কিছু মিল থাকলেও আকারে সেটা চারটে বড় বড় ঘরের সমান। শুধু তাই নয়, মনে হল তার একটা ঢাকনিও আছে। সেটা আপাতত খোলা অবস্থায় একধারে ঝুলছে। শরৎও আমার পিছু-পিছু কোন রকমে সাঁতার কেটে এসেছিল।

হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে একই কথা বলে উঠলাম, 'এর ভেতরে গেলে হয় না!'

জিনিসটা কী এবং কোথা থেকে এল বুঝতে না পেরে মনে মনে একটু ভয় ও সঙ্কোচ আমাদের যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে অসাড় হয়ে মরাই যারা ধ্রুব ভবিতব্য বলে জেনেছে, তাদের পক্ষে আশ্রয় হিসেবে ওকে অবহেলা করা শক্ত।

বিশাল পাত্রটির গা খুব উঁচু নয়। হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেটা শক্ত কোন ধাতুর তৈরি বলেই বোধ হল। মনের মধ্যে যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, শরতের দুর্বল অবস্থা স্মরণ করে তা দূর করে ফেললাম। ঢাকনির ওপর দিয়ে পাত্রটির ভেতর যাওয়া সোজা বুঝে সেইদিক দিয়েই শরৎকে টেনে নিয়ে খানিক বাদে ভেতরে গিয়ে নামলাম। বাইরে থেকে যতটা মনে হয়, পাত্রটির খোল দেখলাম তার চেয়ে অনেক গভীর। লম্বা আমি বড় কম নয়, কিন্তু ভেতর থেকে দেখা গেল দাঁড়ালেও আমার মাথা পাত্রটির কানার কাছে পৌঁছোয় না। শরৎ ক্লান্তিতে ইতিমধ্যেই তলায় শুয়ে পড়েছিল। জিনিসটি যতই রহস্যজনক হোক, আপাতত আমারও

তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের ও দেহের অবস্থা ছিল না। শরতের পাশেই আমি বসে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় শরৎ ধড়মড় করে উঠে বসল।

ধড়মড় করে উঠে বসবার তার যথেষ্ট কারণ ছিল। হঠাৎ টের পেলাম, আমাদের পায়ের নিচে পাত্রের তলা থেকে অদ্ভুত এক শব্দ উঠছে। জাহাজ হলে এ শব্দ ইঞ্জিনের বলতে পারতাম। কিন্তু এখানে এ শব্দ কিসের? শরৎ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাদের মাথার ওপর পাত্রের ঢাকনিটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

সাত

এ রকম অদ্ভুত ঘটনার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। খানিকক্ষণ তো বিস্ময়ে ভয়ে দুজনার মুখে কথাই সরল না। অবশেষে শরৎ বললে, 'এর মানে কী?'

মানে কি ছাই আমিই জানি যে উত্তর দেব! চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, সমুদ্রে ডুবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে শেষে কি আরো বেশি বিপদে পড়লাম! আমাদের পায়ের নিচের শব্দটা তখন খুব বেড়ে গেছে। সমস্ত খোল সেই শব্দের সঙ্গে কাঁপছিল!

আমরা যে খোলটির ভেতর আবদ্ধ হয়েছিলাম সেটিতে কী ভয়ানক যে অন্ধকার তা আর বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। এতক্ষণ তবু আকাশের তারাগুলি দেখা যাচ্ছিল, এখন ঢাকনাটি এঁটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাও আড়াল হয়ে গেল। এই রহস্যময় জিনিসটির ভেতর এভাবে বন্দী হয়ে এখন মনে হচ্ছিল এর চেয়ে বুঝি খোলা আকাশের তলায় সমুদ্রে ডুবে মরাও ভাল ছিল।

দুবার ওপরের ডালাটা দুজনে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু বৃথা। সে ডালা যে কত ভারি তা জানি না, কিন্তু ভারি না হলেও যে রকম জম্পেস হয়ে সেটি বসেছিল, তাতে তা ঠেলা দূরে থাক একটু নড়াবারও উপায় ছিল না।

অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে শরৎকে ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জিনিসটা কী বলতে পার শরৎ?'

তার গলার স্বর শোনা গেল, 'বুঝতে তো পারছি না ভাই। কোনরকম সাবমেরিনের অংশ মনে করতে পারতাম, কিন্তু প্রথমত সাবমেরিনে এ রকম কোন খোল থাকে বলে আমার তো জানা নেই, দ্বিতীয়ত এই সমুদ্রে এই সময়ে সাবমেরিন আসবে কোথা থেকে? এবং এ সাবমেরিন কাদের?'

বললাম, 'জিনিসটা কোনরকম যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে, না? নিচের আওয়াজটাও ঠিক কোনরকম কল চলার শব্দের মত।'

শরতের গলা শোনা গেল, 'সেইটেই তো আরো আশ্চর্যের বিষয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে হঠাৎ এরকম একটা যন্ত্রের আবির্ভাব কোথা থেকে হল ?'

আমি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমাদের পায়ের নিচ থেকে একটা আলো এসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। আমাদের পায়ের নিচে খোলের গায়ে খানিকটা যেন ফাটল বেরিয়ে পড়েছে ; তীব্র আলোটা সেইখান থেকেই আসছে। কিন্তু প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে নিচের দিকে চাইতে-না চাইতে মুহূর্তের মধ্যে সে ফাটল বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ আলোর পর গভীর অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আমাদের চোখের সামনে লাল নীল সব রঙ নাচতে লাগল।

কিন্তু সেই এক মুহূর্তেই আমি যা দেখেছিলাম তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

আট

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। সত্যিই যা দেখেছি তা আমার মনের ভুল কি না ঠিক করবার জন্যে শরৎকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, এমন সময় সে-ই ভীত স্বরে বললে, 'দেখছ ?'

এবার আর কোন সন্দেহ মনে রইল না। আমরা দুজনে যখন একই জিনিস দেখেছি তখন তা মনের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পায়ের নিচে তীব্র আলোর মাঝখানে এক সেকেণ্ডের জন্যে আমরা দুজনেই একটা মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। সে মুখ এক সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেও তার অদ্ভুত আকার আমাদের চোখ এড়ায় নি। মানুষের মুখ ঠিক তাকে বলা চলে না, অথচ মানুষের মুখের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্যও আছে। আমাদের সঙ্গে চোখা-চোখি হতে-না-হতেই, নিচের যে ফাটলটুকু থেকে আলো আসছিল সেটা বন্ধ করে দিয়ে সে-মুখ সরে গেছল।

আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে শরৎ বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটা শয়তানের কাণ্ডকারখানা বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে আমাদের যেমন করে পারি বেরুতেই হবে।'

'কিন্তু কী করে বেরুব !'

অন্ধকারের ভেতর শরতের গলা শুনতে পেলাম, 'অত বড় ভারি ঢাকনিটা কলে ছাড়া আর কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। এই খোলের কোথাও সেই বন্ধ করবার ও খোলবার কল থাকতে পারে—খোলার গা-টা হাত বুলিয়ে দেখ দেখি !'

শরতের এ পরামর্শে বিশেষ আশান্বিত না হলেও চারিধারে হাত বুলিয়ে

খোলের গা-টা পরীক্ষা করতে লাগলাম। প্রথমটা কোথাও কিছু পেলাম না, আগাগোড়া মসৃণ তেলা দেয়াল। কিন্তু খানিকক্ষণ হাতড়াতে হাতড়াতে এক জায়গায় একটা বোতামের মত কি যেন হাতে ঠেকল মনে হল। সেটা নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে একটু টিপতেই যে ব্যাপার ঘটল ও যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কোন মানুষের ভাগ্যে তা দেখা সম্ভব হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

বোতাম টেপামাত্র ঠিক যেমন করে সুতো ধরে টানলে অনেক জানলার কাপড়ের পর্দা গুটিয়ে যায়, সেইভাবে আমাদের খোলের একদিককার পুরু লোহার পাত গুটিয়ে গেল। তারপর আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল, তাতে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সমস্ত বিপদের কথা ভুলে আমরা অবাক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

লোহার পাত গুটিয়ে গিয়ে যে জিনিসটি বেরুল, তাকে খোলের গায়ে কাঁচের একটা লম্বা জানলা বলা যেতে পারে। সেই কাঁচের জানলার বাইরে যতদূর দেখা যায়—জল, শুধু জল। সে জল আবার তীব্র আলোয় আলোকিত। কিন্তু শুধু এই আলোয় উজ্জ্বল জল দেখেই আমরা অবাক হইনি। সেই জলে অসংখ্য রকমের সামুদ্রিক মাছ অদ্ভুত সব সাঁতারের ভঙ্গী করে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তীব্র আলোয় জলের যতদূর দেখা যায় তার ভেতর নানারকমের মাছের ঝাঁক নানা দিক থেকে এসে খানিক আলোর মধ্যে খেলা করে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। সমুদ্রের মাছ যে এত রকমের আছে তা আমাদের কোনদিন জানা ছিল না। এই অদ্ভুত অজানা সমস্ত সামুদ্রিক মাছদের জলের ভেতর স্বাধীনভাবে দেখার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত বোধহয় কোন মানুষের হয়নি। সে মাছের রাজ্য দেখতে দেখতে সত্যি এক-এক সময়ে স্বপ্ন দেখছি কি না সন্দেহ হয়। এ যেন নতুন এক জগৎ—মানুষ অতি বড় কল্পনাশক্তি নিয়েও একবার এ জগৎ ভাবতে পারে না। সে মাছের কত রকম যে আকার আর কত বিচিত্র যে রঙ তা বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, ঐ সামান্য সময়ের মধ্যে মাছের রাজ্যের ছোটখাট যেসব ঘটনা দেখতে পেলাম তাও কম মজার নয়। আমাদের দেশের চাঁদা মাছের মত আকারের নীল রঙের এক ঝাঁক মাছ খানিকক্ষণ ধরে সার বেঁধে এসে আমাদের জানলার কাছে আলোর ভেতর খেলা করছিল। এই ঝাঁকের ভেতর হঠাৎ দলছাড়া হয়ে দুটি অন্য জাতের মাছ কি করে এসে পড়ে কী নাকালটাই হয়ে গেল! এ মাছ দুটি আকারে বেশ বড়—একা-একা হলে গোটা পাঁচেক চাঁদার জাতভাইকে কাবু করতে পারে হয়ত। কিন্তু ঝাঁকের ভেতর পড়ে তাদের দুর্দশার আর সীমা রইল না।

চাঁদার জাত-ভায়েরা চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরে ঠুকরে ঠুকরে তাদের এক মিনিটে একেবারে এমন অস্থির করে তুলল যে তারা আর পালাবার পথ পায় না। কিন্তু বিজয়ী মাছের ঝাঁকের ফূর্তি বেশীক্ষণ টেঁকল না। হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। দু-সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা গেল, আমাদের সামনে আলোকিত জল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। খানিক আগেই অসংখ্য ডানার আলোড়নে যারা জল তোলপাড় করে তুলছিল, তারা যে চোখের পাতা ফেলতে কোথায় এবং কেন সরে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ, তারপরই মাছেদের পলায়নের কারণ বোঝা গেল। দূরের অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকিত জলের গণ্ডীর ভেতর যে প্রাণীটি অলস মন্থর গতিতে ভেসে এল, এরকমভাবে সামনা-সামনি তাকে দেখবার আশা কখনো করিনি। কাঁচের পর্দার আড়ালে থেকেও নিজেদের আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। শুধু এই প্রাণীটিকে ভাল করে দেখবার অদম্য কৌতূহলেই তৎক্ষণাৎ বোতাম টিপে আমাদের জানলা বন্ধ করবার ইচ্ছা কোনমতে সম্বরণ করে রইলাম।

প্রাণীটি একটি প্রকাণ্ড হাঙর। মাছেরা কোন অজ্ঞাত উপায়ে এঁরই আগমন-বার্তা পেয়ে সরে পড়েছিল, এবার বুঝতে পারলাম। হাঙর মহাশয় গদাই-লস্করি চালে এদিক-ওদিক একটু সাঁতরে আবার সরে পড়লেন। ডাঙার জলের প্রাণী-দের কাছে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর, সমুদ্রের ভেতর এই প্রাণীটি তার চেয়ে বেশি বই কম নয় বলেই মনে হল।

এতক্ষণ আমরা দুজনেই কোন কথাই কইনি। হঠাৎ শরতের কথায় চমক ভাঙল। শরৎ বললে, 'কিন্তু আমরা কোথায় আছি বুঝতে পারছ?'

সত্যিই তো! যোগাবিষ্টের মত সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে দেখতে সব কথাই ভুলে গেছলাম।

শরৎ আবার বললে, 'একেবারে সমুদ্রের জলের তলায় আছি তা বুঝতে পারছ?'

বুঝতে খুবই পারছিলাম, কিন্তু উপায় কী! যে জিনসটির ভেতর আমরা বন্ধ হয়ে আছি তার রহস্যেরই তো কোন সমাধান করতে পারছিলাম না!

হাঙরটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার নানারকম মাছের ঝাঁক এসে আলোর ভেতর খেলা করতে শুরু করেছিল। সেইদিকে চেয়ে বললাম, 'এখন ওপরের ঢাকনি খোলা সম্ভব হলেও তো মুক্তি পাবার উপায় নেই—বরং নিশ্চিত মৃত্যু! এখন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের ওপর নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর তো পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

শরৎ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আমাদের পায়ের তলায় আবার সেইরকম

একটা কি যেন খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যে তীব্র আলো আমাদের ওপর এসে পড়ল তাতে দেখতে পেলাম, আমাদের নিচে একটি নয়, তিনটি সেই অদ্ভুত মুখ আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

তাদের মুখগুলো অবশ্য আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাদেরও পায়ের তলা থেকে আলো আসছিল বলে তাদের মুখ খানিকটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও সে সমস্ত মুখের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আমাদের চোখ এড়ায় নি। সে তাদের নাক। তাদের প্রত্যেকের নাকের দুধারে দুটো বিজলি বাতির ডুমের মত কি জিনিস আটকানো আছে মনে হচ্ছিল এবং এই বিকৃতিটুকুর জন্যে তাদের যে কী অমানুষিক দেখাচ্ছিল তা বলতে পারি না।

নয়

আমরা পরস্পরের দিকে কতক্ষণ যে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ নিচের একটি লোক অপরিচিত এক ভাষায় কী যেন বললে, এবং তারপরেই নিচ থেকে জন-দুই-তিন জোয়ান লোক উঠে আমাদের ধরে ফেললে। প্রথমটা আমি জোর করে তাদের বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শরতের কথায় শেষে নিরস্ত হলাম। শরৎ ঠিকই বলেছিল—যাদের খপ্পরে আমরা এরকমভাবে এসে পড়েছি, তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। জোর করে শেষ পর্যন্ত ভাল ফল তো কিছু হবেই না, উল্টে তাদের চটিয়ে নিজেদের সর্বনাশ আমরা তাড়াতাড়ি ডেকে আনব হয়ত।

অবশ্য সর্বনাশের কিছু যে বাকি ছিল তা মনে হচ্ছিল না। সরু চামড়ার একরকম দড়ি দিয়ে সেই কিম্ভূতকিমাকার লোকগুলো যখন আমাদের বাঁধছিল, তখন আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে এরকম একটা অদ্ভুত জলযান কোথা থেকেই বা এল, এ যান যারা চালাচ্ছে তারা কোন্ দেশের লোক এবং আমাদের সম্বন্ধে কি-ই বা তাদের মতলব, যত বুঝতে চেষ্টা করছিলাম ততই সমস্ত মাথা গুলিয়ে ও বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। লোকগুলোর চেহারা অমন অমানুষিক না হলে হয়ত অত ভয় আমরা পেতাম না। কিন্তু যত তাদের মুখের দিকে চাইছিলাম, তাদের অদ্ভুত চাল-চলন লক্ষ করছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখছি—এ যেন কিছুতেই সত্য নয়।

লোকগুলো আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে চ্যাংদোলা করে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল। যে কারণেই হোক, তারা আমাদের চোখ বাঁধেনি—আমরা সমস্তই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের নিচেই একটা সিঁড়ি। সেটা বেয়ে আর-একটি

বৃহদাকার খোলের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবার সময় আমরা চারিদিকের ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বড় জাহাজের এঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে এর আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে, কিন্তু মনে হল এখানে যে-রকম সব জটিল যন্ত্রপাতি সাজানো, চারিদিকে যে বিচিত্র কলকব্জা, এঞ্জিন, মোটর চলছে, তার তুলনায় আমাদের দেখা এঞ্জিন-ঘর ছেলেখেলা মাত্র। এ যেন মানুষের তৈরি জিনিস নয়, বিশ্বকর্মার নিজের ল্যাবরেটরিতে কোনরকমে আমরা যেন ঢুকতে পেরেছি।

এই এঞ্জিন-ঘর পার হয়ে একধারের একটা দরজার কাছে এসে তারা দাঁড়াল। তারপর একটা বোতাম না কি টিপতেই ভেল্কিবাজির মত সামনের দরজাটা যেন চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে একটি ছোট খুপরির মত ঘর, তারই ভেতর আমাদের দুজনকে রেখে তারা বেরিয়ে যাবামাত্র ঘরের দরজাটা আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের মনের অবস্থা তখন কিরকম হয়েছে তা বোধহয় আর বলে বোঝাতে হবে না। খানিকক্ষণ দুজনের কারো মুখ দিয়ে আর কথাই বেরুল না। কী ভাগ্যি ঘরটা অন্ধকার নয়, আমরা শুয়ে শুয়ে আমাদের কারাগারটাকে ভাল করে একবার দেখে নিলাম। ঘরের গঠন সত্যিই আশ্চর্য রকমের। খানিক আগে যেখানে আমরা দরজা দেখেছিলাম সেখানে একটা খাঁজ পর্যন্ত নেই। আগাগোড়া যেন একটা মসৃণ ইস্পাতের পাতে ঘরটা তৈরি। ওপরের দিকে ঘরটা গম্বুজের মত সরু হয়ে এসেছে, সেখান থেকেই ঘরে আলো আসছিল। হাওয়া আসবার বন্দোবস্তও বোধহয় সেখানে ছিল।

পালাবার উপায় বার করবার জন্যে অবশ্য আমরা তখন তন্ন-তন্ন করে দেখেছিলাম না, মনে মনে এটুকু আমরা এতক্ষণে বুঝেছিলাম যে আমাদের ভাগ্য আপাতত এই অদ্ভুত লোকগুলির হাতেই রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। শুধু এই যন্ত্রপাতি, ঘর-দরজা তৈরি করার কায়দা থেকে এই অদ্ভুত মানুষগুলির একটা পরিচয় পাবারই চেষ্টা আমরা করছিলাম। সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়েছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

কতক্ষণ আমরা এরকম চুপ করে ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ শরৎ বললে, 'লোকগুলোর পোশাক লক্ষ করেছ বিনয়?'

লক্ষ না করে উপায় ছিল না। এরকম অদ্ভুত পোশাক কোন জাত কোথাও ব্যবহার করে বলে আমার জানা নেই। প্রথম দৃষ্টিতে সে পোশাকে তাদের উত্তর-মেরুর ভাল্লুক-জাতীয় কোন জীব বলে মনে হয়। তেমনি দুধের মত

শাদা, মোটা লোমশ একরকম আবরণে তাদের সমস্ত গা ঢাকা। তাদের মুখের তামাটে রঙের সঙ্গে সে পোশাক একদম মানায় না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সে পোশাকের ছাঁট। গায়ের চামড়ার মত তাদের সমস্ত দেহে সে পোশাক লেপটে আছে। প্রথমটা পোশাক বলে বোঝাই যায় না।

শরৎকে সেই কথাই বললাম।

কিন্তু এবার শরৎ যা বললে, তাতে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'ওদের পায়ের আর হাতের আঙুলগুলো লক্ষ করেছ ?'

লক্ষ সত্যিই করিনি, শরৎ যা বললে তা শুনেও প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হল।

অনেকটা হাঁসের পায়ের পাতার মত এদের পায়ের ও হাতের আঙুল নাকি পাতলা পর্দায় জোড়া।

মানুষের মধ্যে এ আবার কোন্ অদ্ভুত জাত, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শরৎকে বললাম, 'কোনরকম পাতলা দস্তানাও তো হতে পারে।'

কিন্তু শরতের তা ধারণা নয়।

অনেকক্ষণ দুজনে এই অদ্ভুত লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়েই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম তখন ঘরের ভেতর আলো সমানে জ্বলছে। এই বন্ধ খোলের ভেতর রাত কি দিন কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কতক্ষণ আমাদের ঘুমিয়ে কেটেছে, কোথায় যে আমাদের নিয়ে এই অপরূপ যন্ত্রপোত চলেছে কিছুই জানি না। শুধু খিদেয় যেভাবে নাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল তাতে বুঝতে পারছিলাম, নিমজ্জমান জাহাজ থেকে পালিয়ে আসবার পর থেকে এ পর্যন্ত বড় কম সময় কেটে যায় নি।

উদ্ধার পাবার কথা ভাবিনি, শুধু জীবন রাখবার মত আহারও এদের কাছে পাব কিনা ভেবে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমাদের দরজা তেমনি যেন জাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল। পূর্বের মতই জনকয়েক লোক আবার আমাদের বয়ে নিয়ে কোথায় যে চলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এঞ্জিন-ঘরের ভেতর দিয়ে খানিক গিয়ে আর-একটা সিঁড়ি দিয়ে এরা আমাদের নামাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। সিঁড়িটা দীর্ঘ। এই সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় যে যন্ত্রপোতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম সেটা কত বড়, তার একটা ধারণা আমাদের হল। অনেকক্ষণ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে চলবার পর একটা প্রকাণ্ড লোহার দেয়ালের সামনে আমাদের এনে তারা থামল।

সেই লোহার দেয়াল হঠাৎ দুফাঁক হয়ে দেখা গেল, তার মাঝখান দিয়ে একটা সুড়ঙ্গের মত পথ। সুড়ঙ্গের সঙ্গে সে পথের উপমা করা ঠিক হয়নি,

কারণ পথটা চারিদিকে ঘেরা হলেও সাধারণ সুড়ঙ্গের চেয়ে অনেক প্রশস্ত ও উঁচু এবং আগাগোড়া তা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত।

এখানে দেখলাম আরো অনেক সেই অদ্ভুত আকৃতির লোক আমাদের সঙ্গে জড়ো হয়ে আগে-আগে চলেছে। তাদের সকলেরই গায়ে সেই শ্বেত ভল্লুকের মত পোশাক। লক্ষ করে দেখলাম সত্যিই তাদের হাত-পায়ের পাতা সবারই জোড়া।

পথ অনেকখানি দীর্ঘ, আমাদের পাশ ফিরিয়ে চাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ শরৎ অস্ফুট চিৎকার করে বললে, 'ওপর দিকে চেয়ে দেখ বিনয়!'

মাথাটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে চাইতেই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

আমাদের সুড়ঙ্গ-পথের ওপর দিকটা আগাগোড়া কাঁচের মত একরকম জিনিস দিয়ে ঢাকা। সেই কাঁচের ওপর শুধু জল, সুড়ঙ্গ-পথের আলোয় উদ্ভাসিত অগাধ, ঘন নীল জল। তাতে অসংখ্য বিচিত্র আকৃতির, বিচিত্র বর্ণের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে।

এ আবার কোন্ রাজ্যে এলাম!

দশ

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত রহস্যজনক ঘটনা এবং যে সমস্ত অদ্ভুত দৃশ্যের কথা লিখেছি এবং এর পরেও যা যা ঘটেছিল, সেগুলির অর্থ পরে আমরা বুঝেছিলাম। যেসব ব্যাপার দেখে পূর্বে বিস্মিত হয়েছিলাম, পরে তার আসল কারণ জানতে পেরেছিলাম; কিন্তু তবু গল্পের ধারা বজায় রাখবার জন্য যেমন-যেমন ঘটেছিল, সেইভাবেই এ কাহিনী অনেকটা বলে যাচ্ছি। রহস্যের মীমাংসা যথা সময়েই হবে।

সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম তত একটা শব্দ আমাদের কাছে ক্রমশ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খানিক দূর যাবার পরই মনে হল সাধারণ শব্দ এ নয়, বিরাট যেন একটা জনকোলাহল। এ শব্দের কারণ তখন কিছুই বুঝতে পারিনি।

সুড়ঙ্গ-পথ আর খানিকটা যাবার পরই শেষ হয়ে গেল, আবার দেখা গেল —সামনে একটি বিরাট ইস্পাতের মত জিনিসের ধাতব দেওয়াল। সে দেওয়ালও হঠাৎ কেমন করে ফাঁক হয়ে গিয়ে বিশাল একটি প্রবেশ-পথ বেরিয়ে পড়ল। এখানে এসে অবধি সাধারণ দরজা কোথাও দেখতে পাই নি। সব জায়গাতেই এইরকমভাবে ভৌতিক দেওয়াল ফাঁক হয়ে প্রবেশ-পথ বেরিয়ে পড়েছে।

দেওয়াল ফাঁক হবার পর আমরা যেখানে প্রবেশ করলাম সেটাকে একটা বিরাট গুহা-মুখ বলা যেতে পারে। ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম, আর আলোকোজ্জল জলরাশি সেখানে নেই। বহু উর্ধ্বে সু-উচ্চ ছাদ আছে মনে হল। সামনে পাথরের খাড়া খাড়া দেওয়াল ভেদ করে অনেকগুলি পথ বেরিয়ে গেছে। এখানে সমস্ত পথই দেখলাম পাহাড়ের গা ভেদ করে রেলের টানেলের মত তৈরি করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতে যেটুকু বুঝলাম, তাতে মনে হল একটা বিশাল পাহাড়কে গর্ত করে করে ফোঁপরা করে এরা নিজেদের বাসস্থান বানিয়েছে—উইঢিবির যেন একটা বড় সংস্করণ। আশ্চর্যের বিষয় পথগুলি তেমন আলোকিত নয়, কেমন একটা আবছায়া অন্ধকার সব জায়গায় বিরাজ করছে।

ডান পাশের একটা পথ ধরে আমাদের বাহকেরা এবার অগ্রসর হতে লাগল। সুড়ঙ্গ-পথে যে শব্দ শুনেছিলাম যে শব্দ ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল। বিরাট পুরীটি সে শব্দে গম্‌গম্ করছিল।

যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেখানে লোকজন তেমন নেই মনে হচ্ছিল কিন্তু খানিক বাদেই ভুল ভাঙল এবং ব্যাপার দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলাম। পথের একটি বাঁক ফেরবার সময় আমাদের সামনে একজন লোক এসে পড়েছিল, কিন্তু আমাদের দেখাবামাত্র লোকটা একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে একপাশে সরে গিয়ে আধা অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে যেন নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও আমাদের একজন সঙ্গী তাকে দেয়ালের গা থেকে একহাতে টেনে এনে প্রচণ্ড এক ঘুসির আঘাতে মাটিতে শুইয়ে দিলে। লোকটা বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলে না, শুধু তার চোখদুটো মনে হল ক্রোধ গোপন করবার চেষ্টা সত্ত্বেও হিংস্র হয়ে উঠল। লক্ষ করে দেখলাম লোকটার গায়ের পোশাক আমাদের সঙ্গীদের মত শাদা নয়, পাটকিলে রঙের এবং তাদের দুধারে এদের মত দুটি ঠুলি নেই। তবে তার নাকের গড়নও একটু অদ্ভুত রকমের। আমাদের বাহকরা তার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তাকে সেই অবস্থাতে ফেলে রেখেই এগিয়ে চলল। এই অকারণ অত্যাচারে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ কী!

এর পর থেকে চোখে পড়তে লাগল আমাদের পথের দুধারে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এমনি বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের আসার শব্দ পেয়ে বহুক্ষণ আগে থাকতেই তারা ঐ রকম তটস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ হল। তাদের সবাই বেশ পাটকিলে রঙের। শাদা পোশাকের লোক আমাদের দিক দিয়ে যে-কজন গেল, তাদের কিন্তু ও রকম

সন্ত্রস্ত ভাব নেই, তারা বেশ সহজভাবেই পথের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণের পঞ্চম জাতীয় লোকদের মত এই পাটকিলে পোশাকের লোকদের সম্বন্ধে শাদা-পোশাকীদের অদ্ভুত ব্যবহারে কোন কারণই খুঁজে তখন পাইনি।

আরও কতদূর আমাদের এই পাষাণপুরীর ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবে ভাবছি এমন সময় আমাদের বাহকেরা একটি পথের মোড়ে এসে থামল। যে হট্টগোল বহুক্ষণ আগে থাকতে শুনতে পাচ্ছিলাম, এবার সেটা অত্যন্ত বেশি বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের বিপরীত দিক থেকে একটি শাদা পোশাকের লোক দ্রুতবেগে আমাদের দিকে আসছিল। তাকে দেখেই বোধহয় আমাদের বাহকেরা থেমেছিল।

লোকটা এসে আমাদের বাহককে কী বললে বোঝা গেল না, কিন্তু দেখলাম আমাদের সঙ্গীরা সে সংবাদে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাদের নিচে নামিয়ে একজন একটা ধারালো ছুরির মত জিনিস দিয়ে আমাদের পায়ের বাঁধন কেটে দিলে, এবং আমাদের বদ্ধ হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুতবেগে এবার পাশের সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকে পড়ল।

বেশি দূর এগুতে হল না। হঠাৎ সামনে পেছনে অসংখ্য কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকার শুনতে পেলাম এবং তারপর বন্যার মত দুদিক থেকে অসংখ্য পাটকিলে পোশাকের লোক আমাদের রক্ষীদের ওপর নানা অস্ত্র হাতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুপক্ষের চিৎকারে আর হত-আহতদের আর্তনাদে পাথরের পুরী তখন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পাথরের মসৃন, পরিষ্কার পথ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। খানিক আগেই যাদের ভীত কাপুরুষের মত পথের ধারে নিজেদের আত্মগোপন করতে দেখেছি তারাই যে এমন উন্মত্ত, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমাদের শাদা পোশাকের বাহকেরা নির্ভীকভাবে প্রাণপণে যুঝছিল বটে; কিন্তু বিপক্ষের দল সংখ্যায় অনেক বেশি—ধীরে ধীরে তারা শাদা পোশাকের লোকদের শেষ করে আনছিল।

প্রথম আক্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে আমরা দুজনে রাস্তার একধারে হটে এসেছিলাম। হতবুদ্ধি ভাবটা একটু কাটবামাত্র পলায়নের এই সুযোগ বুঝে আমি শরতের একটা হাত ধরে টেনে বললাম, 'দাঁড়িয়ে দেখছ কী? শিগগির পালিয়ে এস। এখানে থাকলে দুপক্ষের কারুর কাছেই আমরা রেহাই পাব না।' সৌভাগ্যের কথা এই যে বাহকেরা আমাদের তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে যাবার জন্যে পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিল এবং এই পাষাণপুরীতে গোলক-ধাঁধার মত পথের অভাব ছিল না।

আমাদের সামনেই একটি নির্জন গলি-পথ পেয়ে তাই ধরেই আমরা ছুটতে লাগলাম। পা খোলা থাকলেও হাত বাঁধা, ছোটবার বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল এমন নয়। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্ত কাতর দেহ নিয়েও আমরা যথাসম্ভব জোরে চলতে লাগলাম। অবশ্য ছুটতে ছুটতে আমরা বুঝতে পারছিলাম—আশা করবার আমাদের বিশেষ কিছু নেই। এই অপরিচিত পুরীর কিছুই আমরা জানি না। পেছনের আসন্ন বিপদ এড়িয়ে এলেও সামনে যে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন বিপদ অপেক্ষা করে নেই, তা কে বলতে পারে! শুধু ভাগ্যের ওপর অন্ধ বিশ্বাস রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে, এইটুকু আমরা মনে মনে ঠিক করেছিলাম। আপাতত কোথাও একটু আহার ও বিশ্রাম করবার নিরাপদ জায়গা পেলেই আমরা ধন্য হয়ে যেতাম।

কিন্তু বিপদ ঘটল। যে সম্ভাবনার কথা কল্পনায় আসেনি, পরিহাস করবার জন্যেই বোধহয় বিধাতা তাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়ে দিলেন।

শরৎ আমার পিছু-পিছু দৌড়ে আসছিল। আমাদের গলি-পথটি এক জায়গায় এসে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে তিন ধারে চলে গেছে। তার কোন্‌টা দিয়ে যাব শরতের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে পেছন ফিরতেই সবিস্ময়ে দেখলাম পেছনে কেউ নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার! বরাবর সোজা পথ দিয়ে আমরা আগে-পিছে দৌড়ে এসেছি; পেছনে চাইবার প্রয়োজন না হলেও, আমার স্পষ্ট ধারণা শরতের পদশব্দ বরাবর আমার পেছনে পেয়েছি। এর ভেতর থেকে কোথায়, কখন শরৎ অন্তর্ধান হয়ে গেল! এতক্ষণ বাদে সত্যি আমার দুঃখে হতাশায় কান্না আসছিল। এই অপরিচিত রহস্যপুরীতে শরৎ ছাড়া আমার বন্ধু কেউ নেই। এত দূর এত বিপদ একসঙ্গে কাটিয়ে আসার পর এভাবে তাকে হারাব কল্পনাও করি নি। দুজনে দুজনের কাছাকাছি থাকতে পাওয়ার সৌভাগ্য এত প্রতিকূল ঘটনার ভেতরেও মনের যেটুকু জোর ছিল তা এবার হারিয়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সমস্ত শরীর আমার ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভয়ও আমার আর রইল না। এরপর ধরা পড়লেও যেন আমার কিছুই আসে যায় না। নির্বান্ধব পুরীতে, অপরিচিত জাতের হাতে যদি আমার ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক মৃত্যুও ঘটে, তাতেও যেন দুঃখিত হবার কিছু নেই।

শুধু কর্তব্য-বোধেই ক্লান্ত পদে আবার শরতের খোঁজে পিছু ফিরলাম। কিন্তু কোথায় শরৎ! সমস্ত গলিটা পার হয়ে এলাম। এমন কোন একটা রাস্তা চোখে পড়ল না, যেখান দিয়ে শরৎ ভুল করে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে বা তাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর তাহলে শরৎ কি একবার এটুকু

শব্দও করত না? যেখান থেকে আমরা পালিয়েছিলাম সেখানে পর্যন্ত এবার নির্ভয়ে খুঁজতে গেলাম। যে দৃশ্য সেখানে আমার চোখে পড়ল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর বীভৎস কিছু আমি কখনও দেখিনি। সেখানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, শ্মশানের মত সমস্ত পথ নিস্তব্ধ; আর সেখানে অসংখ্য শাদা ও পাটকিলে পোশাকের লোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ পথ জুড়ে পড়ে আছে। আমাদের বাহক-দের বোধহয় সকলকেই নিঃশেষ করে মেরে পাটকিলে পোশাকের লোকেরা অন্য কোথাও চলে গেছে। অস্ত্র-শস্ত্র নিচে অনেক পড়ে আছে। একটি ধারালো ছোরার মত অস্ত্রে নিজের হাতের বাঁধন নিজেই কোনরকমে কাটলাম। তারপর মৃতদেহগুলিকে অনেক উলটে পালটে দেখলাম। সে সমস্ত মৃতদেহের ভেতর অবশ্য শরৎ নেই। বহুক্ষণের ক্লান্তির পর এই বীভৎস ভয়ঙ্কর দৃশ্যে সমস্ত মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। সেখান থেকে সরে পড়বার জন্যে পেছন ফিরতেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। আর জ্ঞান রইল না।

এগারো

কতক্ষণ বাদে জানি না, জ্ঞান হবামাত্র মনে হল কাছে কোথাও একটা খস্-খস্ করে শব্দ হচ্ছে। আমি তখনও দেখি সেই পথের ওপর বহু মৃতদেহের মাঝখানে পড়ে আছি। সে-সমস্ত মৃতদেহের ক্ষত থেকে চোয়ানো রক্ত আমার গায়েও লেগেছে। সমস্ত শরীরটা আবার শিউরে উঠল। কিন্তু যে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম, তার কারণ না জেনে নড়তে সাহস হচ্ছিল না।

খুব ধীরে ধীরে ঘাড়টা ফেরালাম। শব্দের কারণও এবার বোঝা গেল। পাটকিলে পোশাকের দুটি লোক অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মত সেই সমস্ত শব-দেহের মাঝখানে দুটি থলি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা যে কিসের সন্ধান করছিল তাও জানতে দেরি হল না। শাদা পোশাকের একটি লোকের মৃতদেহ উপুড় হয়ে পথের ওপর পড়ে ছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তাদের একজন সেই মৃতদেহের নাক থেকে সেই ঠুলির মত জিনিস দুটি খুলে নিয়ে থলিতে ভরল।

মড়ার ভান করে হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে পড়ে থাকলেও প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল যে তারা আমার ভিন্ন পোশাক দেখে হয়তো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। একবার সন্দিগ্ধ হলে তারা যে কী করতে পারে কিছুই জানা ছিল না। শাদা পোশাকের লোকেরা আমাদের বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, এরা যে দেখবামাত্র মেরে ফেলবে না, তাই বা কে বলতে পারে? জ্ঞান হবার পর থেকে আমার হতাশাটা যেন দূর হয়ে গেছল। মনে হচ্ছিল, প্রাণ থাকতে আশা ছাড়া কাপুরুষের কাজ।

এখনো শরৎকে খুঁজে পাবার এবং এই রহস্যপুরী থেকে উদ্ধার পাবার আশা একেবারে নেই, তাই বা কে বলতে পারে।

আমার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়বার আগেই পালাবার চেষ্টা করব কি না এবং পালালে এই দুজনের হাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না মনে মনে বিচার করছি, এমন সময় ভাগ্যই আমার কর্তব্য স্থির করে দিল। পাটকিলে পোশাকের একজন লোক হঠাৎ একটু চিংকার করে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে এল—আমার হাত-পা বোধহয় আমার অজ্ঞাতে নড়ে উঠেছিল এবং তা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। লোকটা আমার ওপরে পড়বামাত্র আমি হাত ও পায়ের ঠেলা দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর আত্মরক্ষার জন্যে একটি মৃতদেহের পাশ থেকে একটি বল্লমের মত অস্ত্র তুলে নিয়ে সামনে দৌড় দিলাম। তখন আর পথ বিচার করবার সময় ছিল না।

লোকদুটিও তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে আমার পিছু নিল। তাদের হাতে ধরা পড়বার যে ভয়টুকু ছিল, শরীরের এই দুর্বল অবস্থাতেও একটু দৌড়াতেই তা অমূলক বুঝতে পারলাম। শাদা পোশাকের লোকদের মত এদেরও পায়ের পাতা জোড়া। সেই জোড়া পা নিয়ে তারা মাটির ওপর দেখলাম আমাদের মত ভাল করে দৌড়োতে পারে না। আমি তো দেশে থাকতে দৌড়ের জন্যে কত জায়গায় পুরস্কারই পেয়েছি, কিন্তু আমার চেয়ে ঢের নিরেস দৌড়বাজকেও এরা ধরতে পারত না।

কয়েক পা দৌড়েই আমি এদের নাগালের বাইরে চলে গেলাম। সামনে কিছুদূর গিয়ে আমাদের পথটা একটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে একটু আগে পৌঁছতে পারলে, আমি কোন্ দিকে গেছি এরা বুঝতেও পারবে না জেনে আরো জোরে দৌড়োচ্ছিলাম, এমন সময়ে পেছনে আমার অনুসরণকারীদের আবার চিৎকার শুনলাম। সে চিৎকার শিকার-সন্ধানের উল্লাসের নয়, গভীর আতঙ্কের। একটি বিশেষ শব্দ তারা দু-তিন বার সভয়ে উচ্চারণ করলে, শুনতে পেলাম। শব্দটি বাঙলায় 'ভানা' বলে লেখা যেতে পারে। এ শব্দের মানে তখন বুঝিনি, কিন্তু বোঝবার দেরি ছিল না।

সেই মুহূর্তেই আমার সামনে—যেখানে সুড়ঙ্গ-পথটা বেঁকে গেছে সেখানে—দেখলাম বল্লম হাতে তিনটি শাদা পোশাকের লোক আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে। যারা খানিক আগে শাদা পোশাকের লোকদের বিরুদ্ধে অমন করে লড়েছে, মাত্র তিনজনকে দেখে তাদের অত ভয় পাবার কারণ প্রথমত কিছুই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু তার পরেই শাদা পোশাকের লোকেরা গলার এক-রকম অদ্ভুত শব্দ করে পেছন থেকে কাকে যেন ডাকলে। তার পরের মুহূর্তেই

তাদের ডাকে যে-দুটি প্রাণী সামনে এগিয়ে এল, তাদের চেহারা দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। পাটকিলে পোশাকের লোকেরা এদের দেখেই যে আঁৎকে উঠেছে, এটুকু বুঝতে আমার বিলম্ব হল না। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও মানুষের সহচর হিসেবে এ রকম প্রাণী আমি কল্পনা করতে পারি নি।

আমাদের দেখবামাত্র শাদা পোশাকের লোকেরা হুঙ্কার দিয়ে আমাদের তাড়া করলে। তাদের সঙ্গে তাদের সহচর জানোয়ারদুটিকেও আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিতে তারা ভোলে নি। পাটকিলে পোশাকের লোকদুটির সঙ্গে আমিও এদের অনুসরণের লক্ষ কি না তখন ভেবে দেখবার ফুরসত নেই। আবার পেছু ফিরে আমি দৌড়োতে শুরু করলাম। দেখলাম, পাটকিলে পোশাকের লোকেরা আমার অনুসরণ ভুলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমার সঙ্গেই দৌড়োচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে যাদের শিকার-শিকারী সম্পর্ক ছিল তাদের উভয়েরই এখন সমান দুরবস্থা। শুধু শাদা পোশাকের লোক তিনটি থাকলে আমার দুর্ভাবনার বিশেষ কারণ ছিল না, তারা দৌড়ে আমায় ধরতে পারত না। কিন্তু যে জানোয়ার দুটিকে শুধু মুহূর্তের জন্য দেখেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছল, তাদের গতিবেগ ও হিংস্রতা আমার অজানা। পাটকিলে পোশাকের লোকদের ভয় দেখে মনে হচ্ছিল যে তাদের চেহারা যেমন ভীষণ, প্রকৃতি ও শক্তি তার চেয়ে নিশ্চয়ই কম নয়। এক পলকের দেখায় তাদের সঠিকভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সাধারণ দেড়ো কাঁকড়া যদি একটা বাছুরের মত বড় হয়, তাহলে খানিকটা হয়ত সেই ভীষণ জানোয়ারের মত দেখাতে পারে। কাঁকড়ার মতই সে জানোয়ারটির সামনে দুটি ভীষণ দাড়া এবং তাদের রাঙা চোখগুলি থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

প্রাণভয়ে পালাবার সময়েও, এরকম ভীষণ জানোয়ারকে কেমন করে এই অদ্ভুত জাতের মানুষ কুকুরের মত শিকারে শিক্ষিত করেছে, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

একটু দৌড়েই আমি পাটকিলে পোশাকের লোকদের ছাড়িয়ে গেলাম, কিন্তু পেছনে পাথরের মেঝেয় হাড় ঠোকার মত খট-খট শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, আমার গতি যত দ্রুতই হোক এই রহস্যপুরীর ভীষণ জানোয়ারগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা প্রায় আমায় ধরে ফেলেছে।

সেই মুহূর্তে পাটকিলে রঙের একজন লোক আর্তনাদ করে উঠল। নিজের অনিচ্ছাতেও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেই ভীষণ জানোয়ার তার একটি প্রকাণ্ড দাড়া দিয়ে লোকটির কোমরের কাছে কামড়ে ধরেছে। দুটি দাড়ার প্রচণ্ড নিষ্পেষণে লোকটার দেহের হাড় যেন মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল।

আর একটি জানোয়ারও আমাদের ধরে-ধরে। সামনে ঐ দৃশ্য দেখে, কিছুক্ষণ আগেও এই পাটকিলে পোশাকের লোকগুলি আমার শত্রু ছিল কি না তা আর মনে রাখতে পারলাম না। পেছু ফিরে হাতের বল্লম দিয়ে প্রাণপণে সেই জানোয়ারের আগুনের মত রাঙা চোখের ওপর আঘাত করলাম। বল্লমের ফলা জানোয়ারটার চোখ ভেদ করে মাথার ভেতর পর্যন্ত বিঁধে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দাড়া তার খুলল না। একসঙ্গে মানুষ ও জানোয়ার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল—মৃত্যু-আলিঙ্গনে।

বল্লমটা খুলে নিয়ে পরমুহূর্তেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা দেখতে হল। দ্বিতীয় জানোয়ারটি ইতিমধ্যে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। লাফ দিয়ে পাশে সরে গিয়ে তার দাড়ার আক্রমণ ব্যর্থ করলাম বটে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে পাথরের ওপর পড়ে গেলাম।

বারো

পা ফসকে পড়ে যাওয়ায় সেই ভয়ঙ্কর ডানার দাড়ার প্রথম কামড় ব্যর্থ হয়ে গেছল বটে, কিন্তু তাতে আর কতক্ষণ রেহাই পাওয়া যায়! পরমুহূর্তেই ঠিক কাঁকড়ার মত পাশাপাশিভাবে হেঁটে এসে রহস্যপুরীর সেই অদ্ভুত জানোয়ার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করলে। একটি মুহূর্ত! বুঝতে পারছিলাম, আর একটি মুহূর্ত বাদেই সেই ভীষণ দাড়ার আঘাতে আমার শরীরের হাড় গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু সেই একটি মুহূর্তই তখন যেন অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। বায়োস্কোপের ছবিতে যেমন কখনো ক্যামেরার কায়দায় সামান্য একটা ক্ষণিকের ঘটনাকে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে দেখা যায়—আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় আমার মনের সমস্ত শক্তি অসম্ভব রকম সজাগ হয়ে ওঠায় আমিও তেমনি সেই অতিকায় কাঁকড়ার প্রত্যেকটি অঙ্গ-সঞ্চালন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। তার এক পলকের আক্রমণের উদ্যোগ আমার কাছে যেন এক যুগ ধরে চলেছে মনে হচ্ছিল। লোকে বলে, মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে জীবনের সব ঘটনা নাকি এক-এক করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে; কিন্তু আমার সেসব কিছুই হয়নি, শুধু আমার যেন সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক যে পেরেছিলাম তা বলতে পারি না।

কিন্তু ডানার সে আক্রমণের উদ্যোগ আর সমাপ্ত হল না, তার আগেই অবাক হয়ে দেখলাম, পাটকিলে পোশাকের লোকটা হঠাৎ তার হাতের বল্লম দিয়ে পেছন দিক থেকে বিকট সেই জানোয়ারের পিঠে সজোরে আঘাত করলে! বল্লম সে জানোয়ারের পিঠ ভেদ করে একেবারে ভেতরে চলে গেল।

খানিক আগেই যে শত্রু হিসেবে আমায় তাড়া করছিল, অকস্মাৎ তার এই পরিবর্তনের কারণ ভাববার তখন সময় ছিল না। মাটি থেকে বিদ্যুৎগতিতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। শাদা পোশাকের লোকেরা তখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ডানার কামড়ে পাটকিলে পোশাকের যে লোকটি মারা গেছল, তার হাতের বল্লমটা তুলে নিয়ে আমার রক্ষাকর্তার সঙ্গে আমি তাদের দিকে সামনে ফিরে দাঁড়ালাম। বিনা বাধায় ধরা দেব না, এই তখন আমার পণ।

শাদা পোশাকের লোকেরা আমাদের এভাবে রুখে দাঁড়াতে দেখে কি জানি কেন থমকে দাঁড়াল। সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের দুটি অনুচর জানোয়ারকে মারা যেতে দেখে তারা বোধহয় ভড়কে গেছল। আমরা দুজনে একদলে হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, এও তারা বোধহয় আশা করে নি। খানিক নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে তারা দেখলাম পিছু হটতে আরম্ভ করেছে।

তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছে শরীরের এই ক্লান্ত অবস্থায় আমারও ছিল না; তাদের ফিরে যেতে দেখে সত্যই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। খানিক বাদেই তারা সুড়ঙ্গ-পথের বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবার আমি আমার রক্ষাকর্তার দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, বিপদের সময়ে আমায় সাহায্য করলেও এবং শাদা পোশাকের লোকদের বিরুদ্ধে আমার পাশে দাঁড়ালেও সে এখন যেন সন্দিগ্ধভাবেই একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

দুজনেই খানিকক্ষণ দুজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কেউ কারো ভাষা জানি না, কে কী প্রকৃতির লোক তাও জানি না, সুতরাং এ অবস্থায় কী করা কর্তব্য ঠিক করা একটু শক্ত। এতক্ষণে বুঝেছিলাম যে তার সঙ্গীকে ওভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বাঁচাবার চেষ্টা করাতেই সে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিল। আমার বিপদে সাহায্য করার কারণও নিশ্চয় তার তাই। কিন্তু এখন আপাতত বিপদ কেটে যাওয়ার দরুন আমার সংসর্গে থাকা নিরাপদ কি না সে বুঝতে পারছিল না। আমিও অবশ্য গোলে পড়েছিলাম।

তেরো

খানিক দুজন পরস্পরের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকার পর আমিই প্রথম পিছু ফিরলাম। লোকটা যেভাবে তার বল্লম বাগিয়ে ধরেছিল তাতে সন্দেহ হচ্ছিল যে আমি তার দিকে একটু এগুলেই সে ভয় পেয়ে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না। আমি যে তার শত্রুতা করতে চাই না, এটা বোঝাবার জন্যেই

আমি পেছন ফিরেছিলাম। অবশ্য এতে আমার বিপদ কম ছিল না। সে যদি আমায় পেছন থেকে আক্রমণ করত, তাহলে আমার আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় ছিল না। কিন্তু সে-রকম কিছু সে করলে না। আমি ফিরে চলে যেতে যেতে একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম, সে আমার দিকে তখনও বিস্মিতভাবে চেয়ে আছে।

শাদা পোশাকের লোকেরা আবার কোন্‌দিক দিয়ে কখন এসে পড়বে ঠিক নেই। আমি তখন তাকে ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই একটা আশ্রয় খোঁজবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পেছনে তার গলার শব্দ পেয়ে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, লোকটা আমার দিকেই তার জোড়া পায়ে অদ্ভুত হাঁসের মত গতিতে এগিয়ে আসছে। আমার কাছে এসে আমার একটা হাত ধরে কি সে বললে অবশ্য কিছুই ধরতে পারলাম না, কিন্তু তার বল্লমটা যখন সে হাত বাড়িয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আমার বল্লমটা টেনে নিল, তখন সে আমার সঙ্গে বন্ধুতা পাতাতে চাচ্ছে, একটু বুঝতে দেরি হল না। বল্লম বদলাবদলি করে লোকটা আমার হাত ধরে হঠাৎ টানতে লাগল। বুঝলাম, সে কোথাও আমায় নিয়ে যেতে চায়। এই নির্বান্ধব রহস্যময় পুরীতে তখন তার সাহায্য নিতে দ্বিধা করে কোন লাভ নেই। ভাবলাম বিপদ তো সর্বক্ষণই আছে, দেখাই যাক না একবার লোকটাকে বিশ্বাস করে। তার সঙ্গে সঙ্গেই চললাম।

নানা সুড়ঙ্গ, গলিপথ ঘুরে লোকটা একটা জায়গায় এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনের দেওয়াল ফাঁক হয়ে গেল। দেখলাম একটা মার্বেল পাথরের মত মোলায়েম পাথরের তৈরি ঘর। সম্পূর্ণভাবে তার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকতেই পেছনের দেওয়াল আবার বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা যে কী করতে চায়, কোথায় নিয়ে যেতে চায়, তখনও কিছুই বুঝতে পারি নি। আগাগোড়া সমস্ত পথ সে 'বাইধ' 'বাইধ' এই রকম কি একটা কথা অনেকবার উচ্চারণ করেছে। 'বাইধ' যে কী বস্তু—কিছুই অবশ্য আন্দাজ করতে পারি নি।

ঘরে ঢুকে সে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামের মত জিনিস টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের তলা থেকে প্রবলবেগে ঘরের ভিতর জল উঠছে দেখতে পেলাম। প্রথমটা ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেছলাম, কিন্তু মিনিট-দুয়েকের ভেতরই জল যখন আমার কোমর ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত উঠবার উপক্রম করল, তখন হঠাৎ এর ভেতরে কোন দুরভিসন্ধি আছে সন্দেহ করে ভীত হয়ে উঠলাম। লোকটা আমার একটা হাত তখনও ধরে ছিল ; সে হাতটা ছাড়িয়ে আমি এই বিপদ থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কোথায় পালাব ? এ

রহস্যপুরীর কোথাও কোন দরজা নেই। কেমন করে যে এখানে দেওয়াল ফাঁক হয়ে সব বেরোয় কিছুই জানি না। আমাদের ঘরটা এখন মনে হচ্ছিল যেন আগাগোড়া একটা মস্ত পাথর কেটে তৈরি, কোথাও তার পিঁপড়ে গলবার মত ফাঁক নেই! এখান থেকে যাব কোথায়, কেমন করে?

দেখতে দেখতে জল আমার গলা পর্যন্ত উঠল। সত্যি এবার ভীত হয়ে উঠলাম। আমার হাত ছাড়িয়ে নেবার পর-মূহূর্তেই লোকটা আবার সজোরে আমার হাত ধরে নিয়েছিল। রাগে, দুর্ভাবনায় মরিয়া হয়ে তাকে একটা ধাক্কা দিলাম; সে জলের ভেতর পড়ে গেল, কিন্তু তখনই উঠে কেমন যেন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমায় কি বললে। এই রকমে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমার তখন যে রকম রাগ হয়েছিল, তাতে তাকে বোধহয় আমি খুন করতে পারতাম, কিন্তু জলের ভেতর আমি অসহায়। লোকটার কিন্তু দেখলাম জলের ভেতর কিছুমাত্র ভয় নেই। জল আমার গলা ছাড়িয়ে নাক পর্যন্ত উঠেছে, কোনরকমে আমি হাত পা নেড়ে ভাসবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে সে হঠাৎ তার ঝুলি থেকে একটা সেই কুড়োনো ঠুলি বার করে আমাকে ধরে ফেললে। জলের ভেতর ভেসে থাকবার চেষ্টা করতে করতে যতদূর সম্ভব আমি তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলাম, কিন্তু লোকটা নির্বিকারভাবে কি বলতে বলতে সেই ঠুলি আমার নাকে পরিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। ছোট ঘর তখন জলে প্রায় ভর্তি হয়ে উঠেছে, ভাসতে গিয়ে আমার মাথা তখন প্রায় ঘরের ছাদের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে আমি হায়রান হয়ে উঠলাম। যেভাবে জলে ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল তাতে বেশিক্ষণ লড়তে পারব এ ভরসাও ছিল না। খানিক পরে নিশ্বাস নেবার জায়গাই যে থাকবে না। জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আমি মরবার আগে এই এই বিশ্বাসঘাতককে মেরে মরব ঠিক করে তার গলাটা চেপে ধরলাম, কিন্তু জলের ভেতর হাতটা কিভাবে ফসকে যেতেই সে আমার নাকে ঠুলিটা পরিয়ে দিলে। ঘরে তখন প্রায় সবটাই জলে ভর্তি হয়ে গেছে।

এক হাতে আমি ঠুলিটা আবার নাক থেকে খুলে ফেলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম জল আমার মাথা ছড়িয়ে উঠলেও নিশ্বাস নিতে আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না। পরিষ্কার জলের ভেতর লোকটার মুখ এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, দুহাতে আমার দুটো হাত ধরে রেখে সে যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছিল মনে হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তার নাকে কোনরকম ঠুলি নেই; তাই বলে জলের ভেতর তার কোন অসুবিধে হচ্ছে বলেও মনে হল না। আমার সঙ্গী এবার তার থলি থেকে আর একটা গগল্‌স্ চশমার মত জিনিস বার

করে আমার চোখে এঁটে দিলে। এবার আর বাধা দিলাম না। দেখলাম, সেই আঁট চশমার ভেতর দিয়ে জলের ভেতরকার জিনিস বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে, চোখে জল লাগছে না।

পাটকিলে পোশাকের লোকদের নাকের অদ্ভুত গড়নের কথা উল্লেখ করেছি। এবার জলের ভেতর ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম—তাদের গলাও কেমন অদ্ভুত; গলার দুধারে চিবুকের নিচে মাছের কানকোর মত খাঁজ কাটা। পৃথিবীর অনেক অদ্ভুত দেশ, অনেক অদ্ভুত জীবের কথা শুনেছি পড়েছি, কিন্তু এ রকম একটা ব্যাপার কখনও কল্পনাও করতে পারি না। সেই মুহূর্তে সামনাসামনি দেখেও সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

বিস্মিত হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবার সময় অবশ্য তখন ছিল না, সমস্ত ঘর জলে ভর্তি হয়ে যাওয়ামাত্র আমার সঙ্গী দেয়ালের আর-একটা বোতাম টিপে দিলে এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের অপরদিকের একটি দেয়াল সরে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা মর্তের মানুষ নিশ্চয় কোনদিন কল্পনা করে নি।

আমাদের সামনে জল—অগাধ, অসীম, যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জলরাশি। লোকটা আমার হাত ধরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বেরুবামাত্র মনে হল সমস্ত সৃষ্টি যেন উল্টে গেছে! আমার পায়ের তলায় মেঘলা দিনের আবছা আলোয় ঢাকা আকাশ, আর আমার মাথার ওপর যেন তারাহীন অমাবস্যার কাজলের মত ঘন কালো রাত্রি। চোখে না দেখলে সে দৃশ্য বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন।

চলতে চলতে পায়ে মসৃণ মোলায়েম কাদা ঠেকছিল। সে কাদা যেন অসংখ্য জোনাক পোকা গুঁড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে। নিচে যেদিকে চাই সেই কাদা থেকে অস্পষ্ট ঠাণ্ডা এক অদ্ভুত আলো উঠছে। নিচে থেকে সেই আলো ওঠায় আমাদের ছায়া পড়ছিল ওপরে। সে ছায়া দেখলাম ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওপরের ঘন কালো জলে মিশে গেছে।

নাকের ঠুলির এত গুণ আছে কে জানত! এই জলের ভেতরও নিশ্বাস নিতে বা ফেলতে, একটু সামান্য অদ্ভুত-রকম গন্ধ পাওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। এই কাঁচের মত পরিষ্কার জলের ভেতর নিশ্বাস নিতে কোনরকম অসুবিধা না হওয়ায়, কোথায় আছি ভুলে গিয়ে একবার তো অসাবধানে মুখ খুলে খানিকটা জলই খেয়ে ফেললাম। আমার সঙ্গী অবশ্য মাছের মতই অনায়াসে সে জলের ভেতর যাচ্ছিল।

কষ্ট যা কিছু হচ্ছিল চলতে। মাটির ওপর আমি যেমন অনায়াসে এদের ছাড়িয়ে যেতে পারি, জলের ভেতর দেখলাম এদের সুবিধে তেমনি আমার চেয়ে

বেশি। জলের তলার সেই আলোয় উজ্জ্বল কাদার ওপর দিয়ে আমায় একরকম টানতে টানতেই সে নিয়ে যাচ্ছিল।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার সঙ্গে চলতে চলতে আমি নিজের অবস্থার কথা প্রায় ভুলেই গেছলাম। নিচে থেকে যেখানে আলো ওঠে, সেই অদ্ভুত জলের জগতে সবকিছুই আমার কাছে অপরূপ।

যে জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, পৃথিবীর ভাষায় সেটাকে পার্বত্য উপত্যকা বলা যায়। উঁচু-নিচু আলোর প্রান্তর চারিধারে অন্ধকারের কিনারায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে। তার ভেতর দূরে দূরে অদ্ভুত কালো কালো জঙ্গলের মত কি দেখা যাচ্ছিল, কোথাও কোথাও দূরে ঠিক উপুড়-টবের মত ঈষৎ লালচে রঙের একরকম ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। আমার সঙ্গী তারই একটির দিকে চলেছে মনে হল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডুবো-পাহাড়ের পুরী থেকে এই জলের জগতে বেরিয়ে এসে কোনরকম মাছ এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি। কোথাও কোন শব্দ নেই—কোথাও কোন প্রাণী নেই, শুধু মনে হচ্ছিল আমরা দুটি অদ্ভুত জীবই যেন এই জগতের একমাত্র অধিবাসী।

কিন্তু নির্জনতা আমাদের বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। উপুড়করা টবের আকারের উঁচু ঢিবিটার কাছে আমরা প্রায় এসে পড়েছিলাম। এতক্ষণ নিচের মাটি ছিল ফাঁকা, কিন্তু যত এগোচ্ছিলাম তত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্যাওলার মত একরকম জলজ গাছের ঝোপ দেখতে পাচ্ছিলাম। গোটাকতক অদ্ভুত চেহারার নাতিবৃহৎ মাছও এখানে দেখা যাচ্ছিল। উঁচু ঢিবিটার কাছে এসে দেখা গেল সেটা একরকমের বাসস্থান ছোট পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে সেখানে পৌঁছতে হয়। এই চড়াইটি এইরকম শ্যাওলার জঙ্গলে ভর্তি বললেই হয়। মাঝখানে লোকের চলাচলে খানিকটা পথ হয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই আমরা উঠেছিলাম। হঠাৎ আমাদের চারিধারের স্থির জলে একটা আলোড়ন অনুভব করলাম। জলের ভেতরই কানের পর্দায় কি রকম একটা শব্দ যেন লাগছিল। আমি অবাক হয়ে চারিদিকে চাইছি, এমন সময় আমার সঙ্গী আমাকে প্রাণপণে হেঁচকা দিয়ে টেনে পাশের ঝোপের ভেতর ফেলে দিলে। হতভম্ব হয়ে এবারও হাঁ করে খানিকটা জল আমি খেয়ে ফেললাম। আমার সঙ্গে সেও ঝোপের আড়ালে এসে বসে পড়েছিল। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে আমি তার দিকে চাইলাম। ঝোপের অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখলাম, সে হাত তুলে ওপর দিকে দেখাচ্ছে।

ওপর দিকে চেয়ে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। তার পরেই চোখে

পড়ল, ছোটখাট শাদা একটা সামিয়ানার মত কি জিনিস আমাদের মাথার প্রায় হাত চল্লিশ ওপরে ভাসছে। একটু লক্ষ করে বুঝলাম, সেটা কোন প্রাণীর পেট। সামিয়ানার মতই সেটা গোল, শুধু দুধারে বড় বড় দুটো ডানা আছে। সে ডানাদুটি নাড়তে নাড়তে সেই প্রকাণ্ড প্রাণীটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। আমাদের মাথার ওপর থেকে কিছু দূরে সরে যাবার পর জানোয়ারটিকে ভাল করে দেখতে পেলাম। পৃথিবীর কোন প্রাণীর সঙ্গে তুলনা দিতে হলে একমাত্র কচ্ছপের কথাই বলতে হয়। অবশ্য চিড়িয়াখানার সবচেয়ে বড় কচ্ছপও তার কাছে একটা পুতুল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কচ্ছপ পঞ্চাশটা একসঙ্গে করলেও বোধহয় তারা তাদের এই অতিকায় আত্মীয়টির পিঠে আশ্রয় পেতে পারে। চেহারাও তার ঠিক কচ্ছপের মত নয়। এই প্রকাণ্ড জীবটির মুখ কচ্ছপের চেয়ে অনেক লম্বা এবং শুধু তাই নয়, যতদূর দেখতে পেলাম, মনে হল তার পায়ের চিহ্ন নেই। কচ্ছপের চেয়ে এ জানোয়ারটির পিঠ অনেক সমতল।

কিন্তু জানোয়ারটি একটু দূরে যাবার পর আমি যা দেখে অবাক হয়ে গেলাম তা তার বিশালতা নয়।

জানোয়ারটির পিঠের ওপর জন-পাঁচেক শাদা পোশাকের লোক অদ্ভুত গোটাকতক খুঁটির মত জিনিস ধরে বসে আছে।

চোদ্দ

দূরে উবুড়-করা টবের মত যে ইমারতটি দেখা যাচ্ছিল শাদা পোশাকের লোকগুলি তাদের এই অদ্ভুত বাহনের পিঠে চড়ে সেইদিকেই গেল এবং খানিক বাদেই দেখতে পেলাম তারা সেই টবের ছাদে নেমেছে।

পাটকিলে পোশাকের লোকটি তখনও আমার হাত ধরে ছিল। শাদারা টবের ছাদে নামবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ অনুভব করলাম, আমার হাতের ওপর তার মুঠি শক্ত হয়ে উঠেছে। শাদা পোষাকের লোকেরা যে কোন সাধু উদ্দেশ্যে টবের ছাদে যায় নি, এটা আমারও সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু কী যে তারা করতে পারে তার কোন ধারণা আমার ছিল না।

ফলাফলের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমার পাটকিলে সঙ্গীর হাতটা কাঁপছে এইটুকু অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টবাকৃতি ইমারতের তলার একটি স্থান ফাঁক হয়ে কিলবিল করে পাটকিলে পোশাকের লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে। প্রাণভয়ে মানুষের গতিবিধি সর্বত্রই একরকম হয়। তারা যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াবার জন্যে পালাবার চেষ্টা করছিল একটু বুঝতে দেরি হল না।

কিন্তু পালিয়েও তাদের নিস্তার নেই মনে হল। সেই টব থেকে বেরিয়েও

অনেকে—কেন বলা যায় না—বাইরে এসে জলের ভেতর কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল দেখতে পেলাম। ইতিমধ্যে আর-একটি মহাকূর্মের পিঠে আরও একদল শাদা এসে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে। টব থেকে বেরিয়ে যারা কোনরকমে পালাবার চেষ্টা করছিল এদের হাতে তাদের আর রক্ষা রইল না। অতিকায় কচ্ছপের পিঠ থেকে ছোটখাট তাকিয়ার মত কি-একটা জিনিস তারা নিচের এইসব পাটকিলে লোকদের ওপর ফেলে দিতে লাগল। জিনিসটি ভারি অদ্ভুত। নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিধারের অনেকখানি জল একেবারে ঘোর লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে লাল রঙ মিনিট-খানেক বাদেই মিলিয়ে যায় এবং মিলিয়ে যাবার খানিক পরেই দেখা যায়, কাছাকাছি যারা ছিল তারা সবাই কাত হয়ে পড়েছে। জিনিসটাকে একরকম জলের বোমা বলা যেতে পারে। অবশ্য সত্যিকারের বোমার চেয়ে এর ক্ষমতা অনেক বেশি। পৃথিবীর মানুষের তৈরি বোমার চেয়ে জলের বোমা বেশি মারাত্মক ও অমোঘ।

শাদাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে সত্যিই সমস্ত শরীরের ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে শাদাদের ওপর রাগও যেন সামলাতে পারছিলাম না। সমুদ্রের তলায় এই শাদা বা পাটকিলে পোশাকের মানুষদের কারুই সঙ্গেই আমার কোন সম্বন্ধ নেই এবং এরা উভয়ে একই দেশের ও একই জাতের লোক; তাদের দু-দলই আমার কাছে সমান হবার কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন শুধু পাটকিলে লোকদেরই আত্মীয় হয়ে গেছি। তাদের জন্যেই আমার তখন অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছিল।

ক্রমশ দেখা গেল সেই টব-আকৃতি ইমারত থেকে পাটকিলে পোশাকের লোক আর বড় বেশি বেরুচ্ছে না। যারা বেরিয়েছিল তারাও সবাই জলের বোমার আঘাতে তখন মারা গেছে। খানিক বাদে চারিধারে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কূর্মরাজের পিঠে চড়ে যে দু-দল শাদা এসেছিল তারা বারকয়েক সেই জলের বাড়ির চারিধারে প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে গেল।

তাদের ফিরে যাবার সময়ে আর-একটু হলেই আমরা ধরা পড়ে যেতাম। অতিকায় কচ্ছপের একটি অত্যন্ত নিচু দিয়ে—ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। তার সেই বিশাল শাদা পেটটা আমি একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের চারিধারে ঝোপের কাছে বিশাল গলা বার করে সে সম্ভবত একটা গাছের মাথাতেই কামড় দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আচমকা মুখের অত্যন্ত কাছে তার সেই ভীষণ মুখ নেমে আসতে দেখে স্বাভাবিক অভ্যাস-মত ভয়ে চিৎকার করতে গিয়ে খানিকটা জল খেয়ে ফেলে আমি একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেললাম। এটা যে পৃথিবী নয়, এখানে আর যা কর মুখ খোলবার যে

উপায় নেই, সে কথা আমার মনে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে বিষম না লাগলেও অনেক জল খেয়ে ফেলে আমি বোধহয় নড়ে উঠেছিলাম ; আমার সেই মুহূর্তের অস্থিরতা থেকেই আমাদের দেখতে পেয়ে অতিকায় কচ্ছপটি হঠাৎ থেমে গেল। তখন তো ভয়ে আমার সমস্ত বুক শুকিয়ে গেছে। তার সেই জালার মত ভয়ঙ্কর মুখের জলন্ত কয়লার মত রাঙা চোখদুটো তখন আমার দিকেই নিবদ্ধ। ওপরের শাদারা আমাদের দেখতে না পেলেও আমার মনে হল এই অতিকায় জলচরটির হাতেই আজ আমাদের রক্ষা নেই। তাঁর মুখের দুধারের পাটিতে লম্বা দাঁতের সারি দেখে বুঝতে পারছিলাম যে পৃথিবীর ওপরে তার যে বামন আত্মীয়েরা আছে, তাদের মত স্বল্পহারী তিনি নন। নরমাংসে তাঁর বিশেষ অরুচি বোধহয় নেই।

পায়ের তলার সেই মোলায়েম কাদার ওপর অসাড়ভাবে উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে প্রতি মুহূর্তেই সর্বনাশ আশঙ্কা করছিলাম। দুধারের ডানা নেড়ে সেই কচ্ছপ-সম্রাট আরো খানিকটা নেমে এলেন। তাঁর সেই হিংস্র দাঁতওয়ালা মুখটা তখন একেবারে আমার চোখের ঠুলির কাছে। সেই হিংস্র দাঁত না ব্যবহার করে শুধু তাঁর বিশাল দেহের ভার একবার আমাদের ওপর রাখলেই বোধহয় আমরা গুঁড়ো হয়ে যেতাম। কিন্তু কচ্ছপ-রাজের কিছুই করা হল না। আমাদের শত্রুরাই তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে সে-যাত্রা আমাদের রক্ষা করলে।

শাদা পোশাকের লোকেরা কচ্ছপের বিশাল পিঠের ওপর থেকে আমাদের নিশ্চয়ই দেখতে পায় নি। তাদের বাহনের আকস্মিক এই অবাধ্যতায় চটে গিয়ে তারাই তাকে চলাবার ব্যবস্থা করল। হঠাৎ দেখলাম ওপর থেকে বাঁকা একটা ধনুকের বাঁটের মত জিনিস নেমে এল, তার ডগায় কয়েকটা কাঁটা লাগানো। সেই কাঁটা দিয়ে ওপর থেকে শাদা পোশাকের লোকেরা কচ্ছপের পেটে বারকয়েক খোঁচা দিলে। বুঝতে পারলাম পিঠের শাদা শক্ত খোলার ওপর কচ্ছপরাজ কিছু টের পান না বলে তাঁকে চলাবার এই ব্যবস্থা। বারকয়েক খোঁচা খেয়েই কচ্ছপটির বোধহয় নর-মাংসের লোভ আর রইল না। হঠাৎ আমাদের চারিধারের জল দুধারে ডানার ঝাপটে সবেগে আলোড়িত করে সে চলে গেল।

তার পর খানিকক্ষণ পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ছিলাম। আমার সঙ্গীটিই আমায় টেনে তুলল। জলের ভেতর পা টেনে টেনে তখন আর আমি চলতে পারছি না, ক্লান্তিতে প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব। তবু এগুতেই হল।

আমার পাটকিলে সঙ্গীটি দেখলাম সেই টবের দিকেই চলেছে। আমাদের চারিধারে অসংখ্য পাটকিলে পোশাকের মৃতদেহ ভাসছে দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণ আগেই যেখানে কোনপ্রকার জলচর জীবের চিহ্ন ছিল না বলেছি, সেখানে দেখলাম অসংখ্য কালো রঙের অদ্ভুত একরকম মাছ এসে মৃতদেহের চারিধারে জড়ো হয়েছে। মাছ বললে ঠিক তাদের বর্ণনা করা হয় না, অনেকটা চামড়ার ব্যাগের মতই তাদের আকৃতি। চামড়ার ব্যাগের মতই তাদের মুখ-গুলোও দেহের মাঝখানে। চামড়ার ব্যাগকে একধারে কাত রাখলে যেমন হয়, সেই রকমই তারা দেখলাম আড়াআড়িভাবে সাঁতার কাটে। এদের জলের শকুন বলা যেতে পারে। লোভ তাদের এমনি প্রচণ্ড যে আমরা কাছে আসায় তারা সাঁতরে একটু দুরে সরে গেল মাত্র, কিন্তু পালাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করল না। আমার সঙ্গীটি মনে হল রেগেউঠে হাতের ছোট বল্লমচালিয়ে তাদের কটাকে মারবার চেষ্টা করলে। কয়েকটা মারাও গেল। কিন্তু তারা পঙ্গপালের মত অসংখ্য। আমাদের আক্রমণ করবার মত সাহসও তাদের অবশ্য দেখলাম না, কিন্তু ভয়ে তারা বেশি দূরে পালিয়েও গেলনা।। আমরা একটু সরে যাবামাত্র মৃতদেহগুলির ওপর ছেঁকে ধরে পরস্পরের ঝাপটা-ঝাপটিতে জল আলোড়িত করে তুলতে লাগল।

এ বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। প্রতিকার করবারও উপায় নেই বুঝেই বোধহয় আমার সঙ্গী শেষ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দিয়ে এগুতে শুরু করল। ছোট একটা ঢিবির মত উঁচু জায়গার ওপর সেই টবের মত ইমারতটি তৈরি। একটুখানি উঠে আমরা আর পাদমূলে এসে পৌছলাম।

টবের নিচে খানিকটা গহ্বরের মত জায়গা। তার ভেতর আমরা গিয়ে ঢুকতেই অবাক হয়ে দেখলাম, গহ্বরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী সেই জলের ভেতর গহ্বরের গায়ে কি একটা কল স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরের জল নেমে যেতে লাগল। খানিক বাদে দেখলাম সমস্ত জলই বেরিয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে সামনের আর-একটি পথ খুলে গেল এবং আমরা তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম পেছনে তা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেছে। পরে বুঝেছিলাম এখানকার সমস্ত বাড়ি-ঘরই এই কায়দায় তৈরি। বাইরের জল ভেতরে ঢোকবার জন্য ও ভেতর থেকে বেরুবার জন্য প্রত্যেক জায়গায় একটি করে কোনরকম পাম্পের ব্যবস্থাআছে। তার দ্বারা জল বার করে দেওয়া ও ভর্তি করা যায়। চারিধারে যেখানে জল সেখানে এ রকম ব্যবস্থা না করলে সমস্তই জলে জলময় হয়ে যেত। সাধারণভাবে নিশ্বাস ফেলবার কোন ঘর থাকতে পারত না।

কিন্তু তখন আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে। যে প্রকাণ্ড হল-ঘরের মত জায়গায় আমরা প্রবেশ করলাম তারও চারিধারে অনেকগুলি

পাটকিলে পোশাকের মৃতদেহ পড়ে আছে। এইটুকু মাত্র দেখবার পরই আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। আমি সেইখানেই বসে পড়লাম। বসে পড়েই মনে হল আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কোথাও যেন আর হাওয়া পাচ্ছি না। আমার সঙ্গীটি আমায় ছেড়ে একটু এগিয়ে সেই ঘরের দেওয়ালের ধারে কি করতে গেছল, চিৎকার করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শুকনো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা যেন ধোঁয়ায় ভরে উঠতে লাগল। ওরই ভেতর চকিতে মনে হল, নাকের ওপরকার ঠুলিটার জন্যেই বোধহয় নিশ্বাস নিতে পারছি না। ঠুলিটার ভেতর মানুষের নিশ্বাস নেবার যে নকল হাওয়া ছিল তা বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু সমস্ত দেহ-প্রাণ এমনি অবশ হয়ে এসেছে, যে ঠুলিটা টেনে নাক থেকে খুলতে পারলাম না। আমার সঙ্গী কাছে এসে সাহায্য করবার আগেই নিঃশ্বাস না নিতে পেরে আমি মারা যাব বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তবু দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় হাতটা তুলতে পারলাম না। তারপর আর মনে রইল না।

পনেরো

জ্ঞান যখন ফিরে এল অল্প অল্প করে, তখন দেখলাম আমি সেই ঘরেই তেমনি অবস্থাতেই শুয়ে আছি—শুধু আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আমার সঙ্গী আমার বুকের ওপর হাত রেখে বোধহয় আমার হৃৎপিণ্ড নড়ছে কি না পরীক্ষা করছে।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, যে ঠুলিদুটো খোলবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে তখন পারি নি এবং যেগুলিকে আমার দমবন্ধ হয়ে আসার কারণ মনে করেছিলাম, সেগুলি তখনো আমার নাকে তেমনি আঁটা আছে।

আমি মুখ দিয়ে বেশ অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি। এ কথা আগে কেন মনে হয় নি ভেবে লজ্জিত হয়ে গেলাম। নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে না পারলেও যে মুখ দিয়ে অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালানো যায়, সে কথাটা কেন যে ভুলে গিয়েছিলাম কে জানে। কিন্তু তাহলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবার কারণ কী?

সে রহস্যের মীমাংসা অবশ্য তখন খুঁজে পাই নি। পরে জানতে পেরেছিলাম। টব-আকৃতি এই বাড়িগুলির ভেতর কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাসের উপযুক্ত হাওয়া তৈরি করবার কল থাকে। সে কলের আসল চাবি থাকে টবের মাথায় এবং তার অধিকার একমাত্র শাদা-পোশাকীদের হাতে। তারা পাটকিলেদের জব্দ করবার দরকার হলে ওপরে এসে নেমে এই কল বন্ধ করে দেয় এবং সঙ্গে

সঙ্গে আর-একটি যন্ত্র খুলে দেয়, যাতে নকল হাওয়ার সমস্ত অক্সিজেন একেবারে শুষে নেয়। পাটকিলে পোশাকের লোকেরা তাদের গলার দুধারের মাছের কানকোর মত জিনিসটির জন্যে জল থেকে হাওয়া সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু যেখানে জল নেই সেখানে তাদের সাধারণভাবেই নাকের দুটি ফুটো দিয়ে কাজ চালাতে হয়। এর পূর্বে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, তার অর্থ এইবার অনেকটা বোঝা যাবে। শাদাপোশাকীরা ওপরে এসে হাওয়া কল বিগড়ে দেবার পর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবার ভয়ে পাটকিলেরা অমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাইরে জলে বেরুবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেখানেও তাদের যে নিষ্কৃতি মেলে নি তা বোধহয় মনে আছে। আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন আমার ঠুলির হাওয়া নিঃশেষ হয়ে গেছল সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে ঘরের হাওয়াও তখন অক্সিজেনশূন্য হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী বায়ুহীন ঘরেও খানিকক্ষণ তার দুটি কানকোর পুঁজি-করা অক্সিজেনের জোরে টিকতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে এক মুহূর্ত নিশ্বাস না নিতে পারলেই মৃত্যু। আমার সঙ্গী ঘরে ঢুকে হাওয়া-কল ঠিক করবার জন্যেই দেওয়ালের কাছে গেছল। আমার ঠুলিতে যে নকল হাওয়া ফুরিয়েছে, তাই বা সে কেমন করে জানবে? কিন্তু আমার অবস্থা তখন ঘরে ঢুকেই কাহিল হয়ে পড়েছে।

ওপরের শাদারা আসল চাবি ধরে থাকলে অবশ্য নিচে থেকে হাওয়া-কল খোলা সম্ভব হত না। আমার সঙ্গী হয়ত আবার জলে বেরিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারত, কিন্তু আমায় সেই ঘরেই প্রাণ দিতে হত, সৌভাগ্যের বিষয় তখন ওপরে অপর পক্ষের কেউ ছিল না।

খানিক বাদে আমি সুস্থ হয়ে উঠে বসলাম। আমার সঙ্গী আমার নাক থেকে ও চোখ থেকে এবার ঠুলিদুটো খুলে ফেলল, তারপর সে নিজে থেকেই, কী বুঝে জানি না, খয়েরের রঙের একটা ছোটখাট ইটের মত জিনিস এনে দিলে আমার হাতে।

সেই অদ্ভুত জিনিস নিয়ে কী করতে হবে ভেবে না পেয়ে আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সে মুখ নেড়ে কি খানিকটা বলল কিন্তু তার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝব কেমন করে?

এইবার বোধহয় তার মাথাতেও বুদ্ধি খেলল। এবার যে ভাষা সে প্রয়োগ করলে, তা বোঝা একটা শিশুর পক্ষেও সহজ। সেই খয়েরের রঙের ইটটি ধরে সে হঠাৎ একধারে কামড় দিল।

আর আমায় কিছু বলতে হল না। খিদেতে আমার বত্রিশ নাড়ি তখন পাক দিচ্ছে। যুগ-যুগান্তর যেন খাই নি এমনি মনে হচ্ছিল। ইটই হোক আর

প্যাটকেলই হোক, আমি তার হাত থেকে একরকম জোর করেই নিয়ে দিলাম এক কামড়।

স্বাদটা খুব যে ভাল তা বলতে পারব না, কিন্তু পৃথিবীর কোন সুস্বাদু খাবার কোনদিন অত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে খেয়েছি বলে মনে হয় না। জিনিসটায় কেমন একটা মাছের তেলের মত গন্ধ। প্রথমটা শক্ত লাগে দাঁতে, কিন্তু খানিক বাদেই মুখের ভেতর মিলিয়ে যায়।

পরে অবশ্য জেনেছিলাম জিনিসটা তাদের রাজ্যের একরকম অদ্ভুত মাছের জমাট করা তেলই বটে। এই মাছটি তাদের রাজ্যে প্রচুর এবং তার তেল গরিব পাটকিলেদের প্রধান আহার, যেমন বাঙলা দেশের লোকের ভাত আর হিন্দুস্থানীদের আটা। জিনিসটি কিন্তু আমাদের ভাত বা রুটির চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিকর বলেই আমার ধারণা।

আহারের পর জলের প্রয়োজন, কিন্তু সে কথা তাকে কী করে বোঝাবো ভেবে পেলাম না। কারণ, তারই অনুসরণে মুখে গেলাস থেকে খাওয়া, ঘটি করে জল ঢালা এমনকি শেষ পর্যন্ত হাতের আঁজলা করে জল খাওয়ার অভিনয় করে দেখিয়েও কোনও ফল পেলাম না।

কী আশ্চর্য! এরা কি জল খায় না? দীর্ঘকালের উপবাসের পর খাবার খেয়ে তখন আমার তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গী অনেকক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শেষকালে এনে দিল একটা মাছের পটকার আকারের শাদা ধবধবে একরকম জিনিস।

ব্যাপার দেখে আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। এ যেন ঠিক সেই আমাদের—

'তৃষ্ণা নিয়ে চাহিলাম এক গ্লাস জল,
টপ করে এনে দিল একখানি বেল।'

এটাও যে একটা আহার্য তা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু আহার্য নিয়ে আমি কী করব? আমার চাই জল। আরো খানিকক্ষণ হতাশ হয়ে, জলের আশা একরকম পরিত্যাগই করলাম। আমার সঙ্গী কিন্তু সমস্তক্ষণ ধরে আমায় সেই জিনিসটি খাবার জন্যে ইঙ্গিত করেছে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এবং নেহাৎ তার পীড়াপিড়িতেই আমি সেই মাছের পটকার আকারের জিনিসটি মুখে পুরে দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দাঁত দিয়ে একটু কামড়াবামাত্র অত্যন্ত সুস্বাদু পরিষ্কার জলে আমার মুখ ভর্তি হয়ে গেল। জিনিসটি কী তখনও জানতে পারি নি, কিন্তু এইভাবে জল খেতে অভ্যস্ত বলেই

যে আমার সঙ্গী আমার জল খাবার বাসনা মূক অভিনয়ের দ্বারা বুঝতে পারে নি সেটা টের পেলাম।

জিনিসটি কী এবং এ রাজ্যে তার প্রচলনের আসল কারণ অবশ্য পরে বুঝেছিলাম।

ষোল

আমার স্টীমার-ডুবি হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আমার শরীরের ওপর দিয়ে কী ধকল যে গেছে এবং ভেতরে ভেতরে কত ক্লান্ত যে আমি হয়ে পড়েছি, তা বুঝতে পারলাম আহার শেষ করবার পর। মনে প্রচণ্ড কৌতূহল ও উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত শরীর আমার একেবারে অবশ হয়ে এসেছে। তখন কোন-মতেও চোখের পাতাদুটো খুলে রাখবার ক্ষমতাও আর পেলাম না। মানুষের ভেতর যে অদম্য প্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত যোঝে—কিছুতেই হার স্বীকার করে হাল ছাড়তে চায় না, আমি শুধু এতক্ষণ তার জোরেই যেন খাড়া ছিলাম। সামান্য একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় মেলা-মাত্র আমার শরীর একেবারে মনের অবাধ্য হয়ে উঠল।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলুম বলতে পারি না। কারণ সময় নিরূপণ করবার কোন উপায় এখানে নেই। দিন-রাত্রি বলে কোন কথা এখানে থাকাই অসম্ভব। আর ঘড়ি বলে এদের যদি কিছু থাকে তাও এখানে আমার অপরিচিত। ঘুমোবার সময় যে আলো ঘরে দেখেছিলাম সেই আলোই বৃহৎ হলঘরটিতে তখনও আছে। শুধু আমার সঙ্গীটিকে দেখতে পেলাম না।

আহারের পর ঘুমোবার ফলে শরীরটাকে বেশ সতেজ ও হাল্কা বোধ হচ্ছিল। উঠে বসে আমি আমার চারিধারের আবেষ্টনটা একবার দেখে নিলাম, তারপর আমার বর্তমান অবস্থাটা ভাল করে একবার হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করলাম।

আমার অবস্থা সংক্ষেপে বললে এইরকম দাঁড়ায়। স্টীমারডুবির পর আমরা অপরিচিত এক জাতের লোকের হাতে এসে পড়েছি। তারা আবার দু-দলে বিভক্ত। আমরা তাদের মধ্যে এসে পড়বার সময় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেই দু-দলে চলেছে মারামারি। যাদের হাতে আমরা প্রথমে পড়েছিলাম তারা আমাদের একরকম বন্দী করেই নিয়ে চলেছিল, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কী তাদের উদ্দেশ্য ছিল তা জানবার আগেই দৈব ঘটনায় আমরা তাদের হাত ফসকে পালিয়েছি। কিন্তু পালাবার ফলে আমাদের দুই বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি হয়েছে এবং শরৎ যে কোথায় আছে এবং বেঁচেই নিরাপদে আছে কি না, তা আমি কিছুই জানি না। আমি ঘটনাক্রমে যে পাটকিলে লোকটির সঙ্গ পেয়েছি, সে আমার প্রতি প্রসন্ন ও আমার শুভানুধ্যায়ী বলেই এখন ও মনে হচ্ছে, কিন্তু তার নিজের

অবস্থাই কেমন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ যে কী তা আমার অজ্ঞাত কিছু আন্দাজ করবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমার সঙ্গী একেবারে ভিন্ন গ্রহের মানুষ বললেই চলে। আমরা দু-জনে কেউ কারো ভাষা বুঝি না, কেউ কারো রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেও পারিনি। এখন এই অবস্থায় আমার কী কর্তব্য ?

কিছুই অবশ্য ঠিক করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে ভাগ্য ও এই অপরিচিত সঙ্গীটির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেই আমায় থাকতে হবে।

ভাগ্যের কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমার সঙ্গীটি যে নির্ভরযোগ্য, তার পরিচয় খুব শিগগিরই পেতে আরম্ভ করলাম।

আহারের ব্যবস্থা থেকে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল সে শিক্ষা চলতে লাগল।

সেই টব-আকৃতি ইমারতের ভেতরেই আমার সময় কাটছে। তখন পৃথিবীর দিন-রাত্রির মাপে সে সময় যে কত তা আমার পক্ষে বলা অবশ্য কঠিন। কিন্তু কম করে ধরলেও মাস দু-একের আগে সে ইমারত থেকে বাইরে এক পা বাড়ানোও যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে! খিদে পাওয়ার সময় থেকেই এরকম অনুমান অবশ্য আমি করেছিলাম। এর ভেতর আমার শিক্ষা পুরোদমে চলেছিল। আমার পাটকিলে পোশাকের বন্ধু যে-জাতের মানুষই হোক না কেন, নির্বোধ যে নয় এ আমি অল্প দিনেই বুঝতে পারলাম। প্রথম দিনই মূক অভিনয়ের ভাষার সার্থকতা দেখে সে আমায় তাদের ভাষা শেখাবার উপায় ঠাউরে ফেলেছিল। সমস্তদিন আমাদের কোন কাজ নেই। বিপক্ষ দলের ভয়েই বোধহয় আমার সঙ্গী ইমারতের বাইরে বেরুতে তখনও সাহস করে না। সারাদিন সেই টবের ভেতরই আমাদের কাটে। কখনও সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমাদের ইমারতের মাঝামাঝি যে প্রকাণ্ড কাঁচের মত একরকম জিনিস দিয়ে ঢাকা জানলা আছে, তারই সামনে গিয়ে হয়তো আমরা বসি। বাইরের আলোকিত বারি-প্রান্তর আমাদের চোখে পড়ে। সেখানে নানা রঙের অদ্ভুত মাছ ছাড়া আর কিছু নেই। কখনও কখনও কূর্মারূঢ় কয়েকদল শাদা-পোশাকীদের দেখা যায় কিন্তু তারা দূরেই আনাগোনা করে, আমাদের দিকে আসে না। এই ইমারতে যে কেউ থাকতে পারে এ ধারণা তাদের হবেই বা কোথা থেকে! তাদের ডুবো-পাহাড়ের প্রাসাদে কী যে চলছে, দু-দলের ঝগড়ার পরিণাম কী হল সে সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়, কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারি না। কখনও বা সেই ইমারতের নানা অদ্ভুত জিনিস দেখে আমার সময় কাটে। আর এরই ভেতর সারাক্ষণ আমার সঙ্গী তাদের ভাষা আমায় শেখায়। কোন একটা জিনিস দেখিয়ে সে মুখে তাদের ভাষায় তার নাম উচ্চারণ করে, আমিও তার

অনুকরণ করার চেষ্টা করি এবং অনুকরণ বোধহয় ভালই করতে পারি। ধীরে তাদের জিনিসের নাম থেকে নানারকম বিশেষণ, এমনকি তাদের ক্রিয়া-পদ পর্যন্ত আমি শিখে ফেললাম এবং একদিন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ভাল করে বলতে না পারলেও, আমার সঙ্গীর সাধারণ কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বও প্রগাঢ় হয়ে উঠল। আমাদের সঙ্গীর নাম এতদিনে জানতে পেরেছিলাম ; তার নাম নারা। 'ন' অবশ্য 'ন' এর 'ঞ'-র মাঝামাঝি করে উচ্চারণ করতে হয়। নাকের বিশেষ গঠনের জন্যেই বা অন্য যে কারণে হোক এদের ভাষায় আনুনাসিক শব্দের প্রাচুর্য বড় বেশি। কি কারণে বলা যায় না, আমার সত্যকার পরিচয় জানবার জন্যে নারা কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, কিন্তু আমাকে এই বন্দী দশা থেকে উদ্ধার করতে সে যে চায়, এ কথা সে নানাভাবেই আমায় জানায়। অবস্থা আমাদের দু-জনেরই অবশ্য একরকম। ইমারতের সঞ্চিত খাবার ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে এবং এখান থেকে বাইরে বেরুনো যে নিরাপদ নয়, নারার ব্যবহারে তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। এক-এক সময় আমার ভয় হয়, যে হয়ত চিরদিনই এই কারাগারে আমাদের স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে হবে।

যতদিন সম্ভব আমাদের রসদ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আহারের পরিমাণ আমরা ইতিমধ্যেই কমিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমাদের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে এল।

সেদিন শেষ জমাট তেলের দু-টুকরো দু-জনে খেয়ে আমরা বিষণ্ণ চিত্তে ওপরের জানলার ধারে গিয়ে বসেছিলাম।

মানুষের চলাচল না থাকলে জলের রাজ্যের জঙ্গলও পৃথিবীর মত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়ে বলেই মনে হয়। আমাদের আশ্রয়টির চারিধারে ইতিমধ্যেই অদ্ভুত জলীয় বৃহদাকার উদ্ভিদের জঙ্গল হয়ে গেছল। সে জঙ্গল এত ঘন যে তার ভেতর দিয়ে আলো ওঠে না। অন্যমনস্কভাবে সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি চমকে উঠে অবাক হয়ে বললাম, 'নারা', ওগুলো কী বল তো?'

আমাদের জলের মাঠের ঠিক নিচে ঝোপের গাঢ় অন্ধকারের ভেতরও একটা অদ্ভুত জিনিস স্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। ছেলেদের একরকম বাঁশি আছে—সাধারণ অবস্থায় তা গুটিয়ে থাকে কিন্তু ফুঁ দিলেই হঠাৎ লম্বা হয়ে সোজা সামনে অনেকখানি বেড়ে যায়। নিচের অন্ধকারে যা দেখতে পাচ্ছিলাম সে অনেকটা এইরকম। ছেলেদের বাঁশির চেয়ে অবশ্য আকারে শ-খানেক গুণ বড় একটা বেলুন-বাঁশিতে যেন থেকে-থেকে কে ফুঁ দিচ্ছিল আর সেগুলো ফুলে উঠে সামনের দিকে ঠেলে বেরুচ্ছিল লম্বা হয়ে। বাঁশির সঙ্গে এ

জিনিসটির তফাৎ এই যে, এ জিনিসটি সোজা হয়ে ওঠার সঙ্গে ঠিক বর্মা-মুলুকের ছাতির মত একটা জিনিস তার আগায় খুলে যাচ্ছিল। খানিক বাদেই অবশ্য ছাতি গুটিয়ে গিয়ে আবার সমস্ত জিনিসটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করবার আগেই দেখলাম নারা নিজেই তা লক্ষ করেছে। কী কারণে বলা যায় না, তার সমস্ত মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে আমার হাত ধরে এক-রকম টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। মাস-দুই ধরে সারা দিন-রাত তার কাছে শিখলেও তাদের ভাষা-জ্ঞান আমার তখনও অবশ্য সম্পূর্ণ হয় নি। নামতে নামতে অত্যন্ত দ্রুতবেগে সে যা আমায় বোঝাতে চাইছিল তার অর্ধেক কথার মানেই আমি বুঝতে পারলাম না। যে দু-একটা ছাড়া-ছাড়া কথা বুঝতে পারছিলাম, তার কোন সুসঙ্গত অর্থ হয় না। 'যেখানে খুশি যাব,' 'কেউ ধরতে পারবে না', 'খাবার পাব অনেক'—এসব কথার অর্থ কী?

অর্থ বোঝবার অবসরও তখন নেই। আমায় নিয়ে হুড়-মুড় করে নিচে নেমে এসে নারা সেই ডুবো-পাহাড়ের প্রাসাদ হতে সংগ্রহ করে আনা থলি থেকে একটা নতুন ঠুলি বার করে আমার নাকে এঁটে দিলে। চোখের ঠুলি আমি নিজেই এঁটে নিলাম। তারপর ঘরের কোণের একটা ডালা-হীন বাক্সের ভেতর থেকে পাতলা, চ্যাপটা, অনেকটা পানের আকারের কতকগুলো ধাতব পাত কেন যে সে নিলে বুঝতে পারলাম না। সেগুলো আকারে প্রায় দেড় বিঘত লম্বা এবং তাসের ইস্কাবনের চিহ্নের মত তার একটা দিক খুব সুচলো হয়ে এসেছে।

এইবার আবার সেই বন্ধ ঘরে জল পাম্প করা, তারপর বাইরের দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমারতের বাইরে বার হওয়া।

আমাদের আশ্রয়-স্থানটি এই মাস-দুই সময়ের ভেতরই কী রকম জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, ভেতর থেকে আমরা তা কিছুই অনুমান করতে পারি নি দেখা গেল। জলজ উদ্ভিদের বাড় অত্যন্ত বেশি। এরই মধ্যে আমাদের সামনের পথ একেবারে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের ইমারতের গায়েও অসংখ্য জলজ শ্যাওলার ধরনের গাছ জন্মে সেটাকে কতকালের পরিত্যক্ত একটা ভুতুড়ে পোড়ো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মত দেখাচ্ছে।

জলের ভেতর এমনিই জোরে এগোনো যায় না, তার ওপর ঝোপের অন্ধকারে আমার সঙ্গী আমার একটা হাত ধরে অত্যন্ত সন্তর্পণে যেন পা ফেলছিল। কী যে তার মতলব ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ঝোপের ভেতর দিয়ে নিচের সমতল ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

এক জায়গায় এসে নারা হঠাৎ থেমে গেল। ঝোপগুলো সেখানে একটু পাতলা হয়ে এসেছে, নিচের কাদা থেকে যে আলো উঠছে তাতে জায়গাটা একটু অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমাদের সামনে হাত-ত্রিশ দূরে ঠিক নীল রঙের যে গাছটি দেখা যাচ্ছিল হঠাৎ তা থেকে জানলা থেকে যেমন দেখেছিলাম তেমনি একটি বৃহৎ ছাতা ফট করে বেরিয়ে খুলে গেল। খানিক বাদে সে ছাতা যখন বুজে গেল, যখন দেখলাম যা ছাতা ভাবছিলাম সেটি একটি সচল প্রাণী। ছাতা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। পরমুহূর্তে ঠিক বিপরীত দিকে অমনি একটি ছাতা খুলে গেল। এবং সেটা বন্ধ হবার পর দেখা গেল প্রাণীর দেহটি সেই দিকে এগিয়ে আছে।

এমন অদ্ভুত প্রাণী আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। তার দেহের চারিধারে ছাতার মত কতগুলো বাহু যে আছে বলা যায় না। আমাদের চোখের সামনেই নানাদিকে তার ছাতা খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। তার পৃথক কোন পা বা ডানা দেখতে পেলাম না, ঐ ছাতার মত বাহুরদ্বারাই সে জল টেনে যেদিকে খুশি এগোয় মনে হল। সমস্ত বাহুগুলি যখন গুটিয়ে রাখে তখন প্রাণী-টিকে এবড়ো-খেবড়ো একটা খুব মোটা গাছের গুঁড়ির মত দেখায়।

এই প্রাণীর জন্যে নারা কেন অত উৎসাহ প্রকাশ করেছিল বুঝতে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় নারা ডান হাতে সেই ইস্কাবনের মত ধাতব পাত একটি বাগিয়ে ধরল। তারপর অদ্ভুত কৌশলে সেটা সেই প্রাণীটিকে লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল।

এটা যে জলের মধ্যে ব্যবহার্য একরকম যন্ত্র এটুকু বুঝতে আমার তখন আর বাকি ছিল না। জলের ভেতর ছোঁড়বার সুবিধের জন্যে ঐ যন্ত্রটি পাতলা ও চ্যাপটা করে তৈরি। আরও কৌশল করে ছুঁড়তে পারলে সে জিনিসটি ঠিক তীরবেগে জল কেটে সামনে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষভেদ করতে পারে।

যে কারণেই হোক নারার লক্ষ ঠিক হয় নি। অস্ত্রটি সামান্যের জন্যে ফস্কে গেল এবং সেইসঙ্গে যে প্রাণীটির গতি অত্যন্ত মন্থর বলেই ভেবেছিলাম তার অসাধারণ ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমাদের চারিধারের জল তোলপাড় করে দ্রুতগামী এঞ্জিনের পিস্টনের চেয়েও তাড়াতাড়ি তার এক-দিকের দুটি ছাতা-হাত চালিয়ে সে যে পলকের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ভেবেছিলাম নারা এবার ব্যর্থ হয়ে ইমারতে ফিরবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এ প্রাণীর চাল-চলন তার জানা, সে আমার হাত ধরে

আরও নিচে আলোর দিকে নামতে লাগল। দেখলাম তার অনুমান মিথ্যা নয়। অত জোরে বেরিয়ে গেলেও প্রাণীটি বেশি দূরে যায় নি। শ-খানেক গজ দূরেই একটি আলোকিত স্থানে পাথরের মত স্থির হয়ে আছে। পৃথিবীর ওপরকার অনেক প্রাণীর স্বভাবও এমনি আমি জানি, সেজন্যে বিশেষ বিস্মিত তখন হলাম না। কিন্তু নারা এবারেও তাকে আঘাত করবার সুযোগ পেল না। ইস্কাবন-যন্ত্র ছোঁড়বার মত কাছাকাছি যেতে-না-যেতেই আবার ভয় পেয়ে প্রাণীটি তরিবেগে সেখান থেকে অন্য দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এবারেও বেশি দূরে সে গেল না, তার ভাব দেখে মনে হল রামায়ণের সোনার হরিণের মত সে যেন আমাদের ছল করে ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আশ্রয় থেকে অনেক দূরে আলোকিত সমতল ক্ষেত্রে নেমে এসেছিলাম। অনেক কষ্টে প্রাণীটির অত্যন্ত কাছাকাছিও এবার সন্তর্পণে আসা গেছল। নারা অস্ত্র ছোঁড়বার উদ্যোগও করছে, এমন সময় দৈবাৎ পেছন ফিরে আমি একেবারে শিউরে উঠলাম। মাত্র একশো গজ দূরে তিন-চারটি মহাকূর্মের পিঠে প্রায় জন-বারো সাদা-পোশাকী আমাদের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। তারা যে আমাদের দেখতে পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। কারণ আমরা পরিষ্কার সমতল আলোকিত জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, শ-তিনেক হাতের ভেতর কোথাও একটা সামান্য শ্যাওলার ঝোপও সেখানে নেই। আমাদের দিকে লক্ষ রেখে তাদের সেই লম্বা বঁড়শির মত চালনা-দণ্ড দিয়ে দেখলাম তারা তাদের বাহনের পেটে অনবরত খোঁচা দিচ্ছে।

ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে আমি নারার হাত ধরে টান দিলাম। কিন্তু সে তখন তার অস্ত্র ছুঁড়তেই তন্ময়। যেন বিরক্ত হয়েই আমার হাতটা বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

সভয়ে আর-একবার পেছন ফিরে দেখলাম, বিপক্ষ দল পঞ্চাশ গজের ভেতর এসে পড়েছে, অতিকায় কূর্মগুলিও আমাদের ধরবার আশাতেই যেন তাদের ভীষণ দাঁতাল মুখগুলো বাড়িয়ে সজোরে ছুটে আসছে।

সতেরো

পরমুহূর্তে জলের ভেতরই কানে একরকম শব্দের মত স্পন্দন অনুভব করলাম। আমার সঙ্গী তখন তার ইস্কাবন-অস্ত্র—ঠিক যেমন করে কাত-ভাবে বাজি-কর তাস ছোঁড়ে সেইভাবে সামনে নিক্ষেপ করেছে। তীরের মত জল কেটে সেই পাতলা অস্ত্র গিয়ে এবার জানোয়ারটির গায়ে বিঁধে গেল। সঙ্গেসঙ্গে কানের ভেতর যে আওয়াজটি অনুভব করেছিলাম সেটি আরও প্রবল হয়ে আমাদের

ঠিক পাশেই জলের ভেতর একটা বিস্ফোরণের মত ব্যাপার ঘটল। জলের ভেতর যেন একটা কি ফেটে গেছে মনে হল এবং খানিকটা জায়গা তার সঙ্গে গাঢ় বেগুনে রঙে রঞ্জিত হয়ে গেল।

নারা এবার আমার সঙ্গেই একবার পেছনের দিকে ফিরে তাকাল। দেখা গেল অতিকায় কচ্ছপগুলি আরও এগিয়ে এসেছে এবং তার ওপর থেকে লম্বা চোঙের মত একরকম জিনিস কয়েকজন শাদা-পোশাকী বাগিয়ে ধরে আছে। সেগুলো যে একরকমের জলবন্দুক এবং আমাদের লক্ষ করেই যে তারা সেগুলো চালাচ্ছে এটুকু বুঝতে দেরী হল না। সামান্যের জন্যে অনেকগুলি গুলি ফসকে আমাদের আশে-পাশে ফেটে গেল। এ গুলি শুধু যে গায়ে লাগলেই বিপদ তা নয়, যেখানে ফাটে সেখানে থাকলেও নিস্তার নেই—অনেকখানি জল এ গুলিতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

এবার আর নারার সে আগেকার মত শান্ত ভাব নেই। ক্ষিপ্র-গতিতে আমাকে টেনে সে সামনের জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে চলল। বর্ণনা করতে যতক্ষণ লাগল ব্যাপারগুলি অবশ্য তার অনেক কম সময়ের মধ্যেই ঘটল। নারার অস্ত্র-নিক্ষেপ, আমাদের চারিধারে জল-গুলির বিস্ফোরণ ও আমাদের পেছন ফিরে চেয়ে দেখেই সামনের দিকে দৌড় দেওয়া—পর-পর ঘটনাগুলি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটেছে। এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের নিরুপায় অবস্থাটাও আমি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করেছি। পেছনে আমাদের প্রবল সশস্ত্র দ্রুতগামী শত্রু। সামনে চারিধারে লুকোবার মত একটা জলীয় উদ্ভিদের ঝোপও নেই, আমাদের জলের ভেতর পালাবার ক্ষমতাও অত্যন্ত পরিমিত; এ অবস্থায় কী আশায় নারা আমায় টেনে নিয়ে চলেছে আমি বুঝতে পারলাম না। একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রথমটা আমার নজরে পড়ে নি, এইবার পড়ল। সেই অদ্ভুত ছাতা-জানোয়ারটি ইস্পাবন-অস্ত্রে বিদ্ধ হওয়ার পর আর নড়ে নি। সেইখানেই মড়ার মত স্থির হয়ে আছে—তার সে বিদ্যুতের মত গতি কেমন করে লুপ্ত হল কে জানে।

জলের জগতে এ পর্যন্ত এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে যা আজগুবি বলে মনে হবে। অনবরত সেসব দেখে বিস্মিত হতেই প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু এবার নারা যে কাণ্ড করল তাতে নতুন করে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ভয়ে নারার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! পেছনে যখন শত্রুরা আমাদের প্রায় ধরে-ধরে, সেই সময় নারা আমাকে টেনে নিয়ে একরকম জোর করেই সেই ছাতা-জানোয়ারের প্রকাণ্ড পিঠের ওপর আমায় তুলে দিল। জানোয়ারটা তখনও তেমনি মড়ার মত স্থির হয়ে আছে। শামুকের

ভেতরের শাঁসের মত তার পিঠটা নরম। আমি বসতেই ঠিক নরম ফুলের পাপড়ির মত পিঠটা খানিকটা বসে গেল। নারাও দেখলাম আমার সঙ্গে তার পিঠে এসে উঠেছে। জানোয়ারটি তখনও নড়বার নাম করে নি।

অবাক হয়ে নারার মতলবটা বোঝবার চেষ্টা করেছি, এমন সময় একটা হাত দিয়ে আমায় সেই জানোয়ারের পিঠে উপুড় করে ফেলে, ইস্কাবন-অস্ত্রটি তুলে নিয়ে নারা আমাদের পেছনে জানোয়ারটির গায়ে মৃদু আঘাত করলে। নিজেও সে তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ভাগ্যিস উপুড় হয়ে পড়ে জানোয়ারটির পিঠের কুঁজের মত একটি গুটানো ছত্রবাহু ধরে ফেলেছিলাম, নইলে সেদিন কোনমতেই আমার জীবন রক্ষা হত না। পেছনে অতিকায় কূর্মগুলি তখন মুখ বাড়িয়ে আমাদের প্রায় ধরে-ধরে। শিকার একেবারে হাতে মনে করেই বোধহয় শাদা-পোশাকীরা গুলি আর ছুঁড়ছে না। এমন সময় প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের অদ্ভুত বাহনটি তার সামনের দুটি ছাতা-হাত নেড়ে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল।

সে কী গতি! মনে হল জীবন্ত একটা টর্পেডোর পিঠে যেন বসে আছি। হু-হু করে জলের স্রোত আমাদের যেন উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করে গায়ের চারিধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ধরে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল, যেকোন মুহূর্তে জানোয়ারটির পিঠ থেকে খসে পড়তে পারি।

প্রায় দুশো গজ দূরে গিয়ে জানোয়ারটি একবার থামল। পলকের জন্যে পেছন ফিরে চাইলাম। জলের ভেতর দুশো গজ অনেক দূর। ভাল করে অত দূরের জিনিস দেখাই যায় না। তবুও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, একেবারে নাকের তলা দিয়ে শত্রুকে পালিয়ে যেতে দেখে প্রথমটা বোধহয় হকচকিয়ে গেলেও সাদা-পোশাকীরা সার বেঁধে কূর্মপৃষ্ঠে আমাদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। দু-একটা গুলিও আমাদের দিকে তারা ছুঁড়ল কিন্তু জল বন্দুকের গুলি বেশি দূরে যায় না। আমাদের পেছনেই সেগুলো ফেটে গেল। আমাদের কাছে পৌঁছল না।

আর কিছু দেখবার সময় হল না। নারা আর-একবার জানোয়ারটির গায়ে আঘাত দিতেই আবার দৌড় আরম্ভ হল।

এরকম অদ্ভুত বাহনের কথা কোনদিন কেউ কল্পনাও করেছে কি না জানি না। যেমন বিদ্যুতের মত তার গতি, তাকে চালানোও তেমনি সোজা। জানোয়ারটির চারিধারেই ছাতা-হাত। যেদিকে যাওয়া দরকার তার উল্টো দিকে জানোয়ারটির গায়ে আঘাত করলেই তীরবেগে সে ছাতা-হাত চালিয়ে এগিয়ে যাবে। সামনে, পেছনে, পাশে, যে কোন দিকে তাকে ইচ্ছামত চালানো

যায়। নারা যে কেন এই জানোয়ারটি ধরবার জন্যে অত ব্যাকুল হয়েছিল এইবার বুঝতে পারছিলাম। পরে জেনেছি এ জানোয়ারটি অত্যন্ত নির্বোধ বলেই তার বিদ্যুৎগতি সত্ত্বেও ধরা পড়ে। সামান্য আঘাত লাগলে সে যেমন পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়, বেশি একটু আঘাত লাগলেই তেমনি হতভম্ব হয়ে আরো অনেক প্রাণীর মত সে মৃত্যুর ভান করে। তার পৃষ্ঠে আরূঢ় হবার সেই সুযোগ।

আমাদের বাহনটি এক-এক দৌড়ে দেড়শো-দুশো গজ পার হয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছিল। উজ্জ্বল জলের রাজ্য ছেড়ে আমরা ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছিলাম সেখানে জলীয় উদ্ভিদের অরণ্যে সমস্ত অন্ধকার। পেছনে আমাদের শত্রুরা ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসছিল।

অনেকক্ষন এইভাবে যাবার পর আর কূর্মবাহন শাদা-পোশাকীদের দেখা গেল না। তবু খানিকক্ষণ নারা ছাতা-জানোয়ারটিকে থামতে দিল না। চারিধার এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আশে-পাশে ভূতের মত সব বিশাল জলীয় উদ্ভিদের ঝোপ। সে ঝোপ যখন অত্যন্ত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল তখন নারা ছাতা-বাহনকে থামালে। মনে হল শাদাদের হাতে ধরা পড়বার তেমন ভয় আর নেই। উপযুক্ত মূহূর্তে সৌভাগ্যক্রমে এই জানোয়ারটিকে আয়ত্ত করতে পেরে এ যাত্রা আমরা বেঁচে গেছি।

কিন্তু বেঁচে সত্যিই কি গেছি? কোন্ জায়গায় যে এসে পড়েছি কিছুই জানি না। নিচের কাদা থেকে সামান্য যে আলো এখানে উঠেছে তাতে চারিধারের কিছু প্রায় দেখা যায় না। এখান থেকে একটা কোন আশ্রয়ে তো আমাদের পৌছতে হবে! কোথায় সে আশ্রয়?

খিদেয় ও তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছিল। তৃষ্ণা মেটাবার সুযোগ আছে বলেই মনে হল। মাছের পট্কার মত যে ফলটি এরা পানীয়ের বদলে ব্যবহার করে, চারিধারে তা অজস্র গাছে ফলে আছে। জলের ভেতর হাঁ করে তার একটি দুটি মুখে পুরে দিয়ে জলের অভাব দূর করা যাবে। কিন্তু আহার? আহার যদি-বা মেলে আমাদের পক্ষে জলের ভেতর তা খাওয়া কেমন করে সম্ভব! তা ছাড়া এইখানে আমার ঠুলির বাতাসই বা কতক্ষণ থাকবে।

জলের ভেতর কথা কওয়া যায় না। নারা যে এই বিপদে কী করবে ঠিক করেছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এই অজানা রাজ্যে তার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই জেনেই চুপ করে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম।

খানিক কি যেন ভেবে নিয়ে নারা হঠাৎ সেই ইন্ধান-অস্ত্রটি সজোরে

আবার জানোয়ারটির পিঠে এক জায়গায় বসিয়ে দিলে। তারপর আমার হাত ধরে টেনে সে আমায় নামবার ইঙ্গিত করলে। বুঝলাম জানোয়ারটিকে এক জায়গায় ধরে রাখবার এই পদ্ধতি। পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্মম বলে অবশ্য মনে হয়েছিল।

জানোয়ারটি এধারে-ওধারে তার ছাতা-হাতখোলবার যেটুকু চেষ্টা করছিল, অস্ত্রাঘাতের পরে সেসব একেবারে থেমে গেল; সে একেবারে নিস্পন্দ। নারার ইঙ্গিতমত তখন তার পিঠ থেকে নামলাম। এখানে পায়ের তলায় কাদা অত্যন্ত গভীর, তা ছাড়া চারিধারে এখানে এত রকমের বিদ্ঘুটে আকারের গাছ ও অন্যান্য ছোটখাট জলচর প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে যে প্রতি পদে এগুতে ভয় হয়। মনে হয় তারা বুঝি আক্রমণ করবে।

কিন্তু তাদের দেখলাম ভ্রূক্ষেপ নেই। আসঙ্কোচে তারা আমাদের চারিধারে সাঁতরে বেড়াতে লাগল।

প্রথমে নেমেই আমরা কয়েকটি পটকা-ফল মুখে দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। তারপর নারা আমার হাত ধরে সন্তর্পণে একধারে এগুতে লাগল।

বিপদ আমাদের যত বড়ই হোক, চারিধারের দৃশ্য দেখে তা না ভুলে থাকা যায় না। জলের রাজ্যের দুর্ভেদ্য অরণ্য—কিন্তু অরণ্য বললে তার কিছুই বর্ণনা হয় না। পৃথিবীর গভীরতম জঙ্গলের সঙ্গেও তার কোন মিল নেই। কোন অসাধারণ চিত্রকর উন্মত্ত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দেখেও এমন চিত্র বোধহয় কল্পনা করতে পারত না। আমাদের চারিধারে বিশাল জলজ সব গাছ—কত বিচিত্র তাদের আকার, কত বিচিত্র তাদের রঙ! আসলে তাদের অনেকগুলি গাছই নয়—নানা ধরনের প্রাণী। তারা ইচ্ছে করলে একটু-আধটু নড়ে বেড়াতেও পারে।

এই অরণ্যে বিপদ যে কত তা অবশ্য খানিকক্ষণ যেতে-না-যেতেই বুঝতে পারলাম। আমাদের চারিধারে অসংখ্য যেসব বিচিত্র আকারের জলচর প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের দেখেই আমি প্রথম ভয় পাচ্ছিলাম। তাদের অধিকাংশের নিজের গা থেকেই আলো বেরোচ্ছে! এক-একটি আকারে বড় একটি পিপের মত। কিন্তু তাদের সবাই নিশ্চয় হিংস্র নয়—অন্তত বিপদ প্রথম তাদের কাছ থেকে না এসে এমন দিক থেকে এল যে-দিকের কথা আমি কল্পনাও করি নি।

ঘন-সন্নদ্ধ জলীয় গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে আমরা চলেছি। এখানে তার বাহনকে চালানো সম্ভব নয় বলেই যে নারা তাকে থামিয়ে রেখে এসেছে এটুকু এবার বুঝতে পারছিলাম। একটি অপরূপ গাছ বহুদূর থেকেই

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গাছ অবশ্য সেটি ঠিক নয়। প্রকাণ্ড একটা মিছরির কোঁদার মত তার নিচের দিকটা গোলাকার। অনেকটা স্ফটিকের মতই তার রঙ এবং তার ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ আলো বেরুচ্ছে। সবচেয়ে অপরূপ গাছের ওপরের দিকটা। সেখানে অনেকটা কেয়াফুলের মত আকারের বহু চমৎকার রঙের শাখা ধীরে ধীরে জলের স্রোতে দুলছে। গাছটার কাছে এসে সেটা ভাল করে দেখবার জন্যে নারার হাত ছাড়িয়ে আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছিলাম। নারা প্রথমে আমার গতি বোধহয় লক্ষ করে নি। অনেকক্ষণ ধরেই নিচের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে দেখতে সে চলেছিল। আমি গাছটার হাত-পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়তেই অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটে গেল। মিছরির কোঁদার মত যে গাছের তলাটা মসৃণ গোলাকার মনে হয়েছিল, ছেলেদের কাগজের ফুলের মত হঠাৎ সেটা যেন খুলে গেল। গাছটা যেন এতক্ষণ নিজেকে ভাঁজ করে রেখেছিল, হঠাৎ তার গা-ময় পাপড়িগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু বড়-বড় ফোকর তার গায়ে ফুটে উঠতে দেখলাম।

সেই সময় চারিধারের জলে অসম্ভব একটা আলোড়ন অনুভব করলাম। পা যেন আর কাদায় রাখতে পারছি না। ঘুর্নির মত সেই গাছটির দিকে জলের স্রোত আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাদার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে সে আকর্ষণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে মসৃণ কাদায় ধরবার মত কিছু নেই। প্রতিমুহূর্তেই বুঝতে পারছিলাম সেই গাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গহ্বরের মত বড় বড় সে গাছের দেহের বহু কোটর আমার জন্যে হাঁ করে আছে! আমার চোখের সামনেই অনেকগুলো বড়-বড় মাছ জলের টানে সেই গাছের গভীর সব ফোকরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আঠারো

মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিচ্ছি, এমন সময় অনুভব করলাম পেছন থেকে আমার পায়ের গোড়ালি কে চেপে ধরেছে।

বুঝলাম যে নারাই আমার বিপদ বুঝে আমার সাহায্যে এসেছে। কিন্তু তখন আর সময় আছে বলে মনে হল না। প্রাণপণ শক্তিতে দুজনে ধস্তাধস্তি করা সত্ত্বেও গাছের পেষণে জলের স্রোতের সঙ্গে আমরা তিল তিল করে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মিনিট-দশেক এইভাবে যুঝবার পর ক্লান্ত হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ গাছটা আবার সেই পূর্বের মত গুটিয়ে গেল। তার মসৃণ উজ্জ্বল গা দেখে তখন কে বুঝবে যে অত শয়তানি তার ভেতরে আছে! গাছটি স্বাভাবিক অবস্থা পাবার পরই জলের টান বন্ধ

হয়ে গেছল। তৎক্ষণাৎ নারা আমাকে ধরে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বহু দূরে গিয়ে তবে থামল। আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে বুকের ভেতরটা তখনও আমার কাঁপছে। পেছনে ফিরে চেয়ে দেখলাম গাছটি তেমনি তার মনোহর পুষ্পবাহু দিয়ে তখন আশ-পাশের জীবজন্তুকে প্রলুব্ধ করছে। তার ভীষণতার অনুমান তবু বোধহয় একটি ব্যাপার থেকে আমার করা উচিত ছিল। এই বন-জঙ্গলের ভেতরও সে গাছটির দশ হাতের মধ্যে কোন গাছপালা নেই। দু-দুবার আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমার নারার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু জলের ভেতর তা অসম্ভব।

এ ব্যাপারের পর প্রতি পদেই আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। সৌভাগ্যের বিষয় নারা আর বেশিদূর গেল না। নিচের দিকে চাইতে চাইতে এক জায়গায় এসে সে থামল। এখানে তলার কাদার রঙ একটু আলাদা। স্পঞ্জের মত ছোট ছোট একরকম জলজ গুল্মও চারিধারে বিছিয়ে আছে। সেই-খানে নিচু হয়ে নারা হঠাৎ কাদা খুঁড়তে আরম্ভ করলে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু খানিক বাদেই কাদার ভেতর সুবৃহৎ কুমড়োর মত একটা জিনিস সে যখন বার করে নিয়ে এল, তখন ব্যাপারটা সরল হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম জিনিসটি আমাদের আহার্য এবং নারা এতক্ষণ এরই সন্ধান করছিল। জিনিসটি আমার হাতে তুলে দিয়ে নারা আবার কাদা ঘাঁটতে আরম্ভ করল হাতে করে যতদূর বুঝলাম সেটা কোনপ্রকার প্রাণীর ডিম। আমাদের মত নিরস্ত্র অসহায় লোকের পক্ষে অন্য কোন খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ নয় বুঝেই বোধহয় নারা এতক্ষণ এই ডিমের গোপন স্থান খুঁজছিল। দেখতে দেখতে আরো গুটিকতক ডিম সে খুঁড়ে বার করলে। উৎসাহিত আমিও এবার তার সঙ্গে যোগ না দিয়ে পারলাম না। জমাট তেল খেয়ে খেয়ে মুখে তো অরুচি ধরেছিলই, তার ওপর আমাদের আশ্রয়ে জমাট তেলও কদিন ধরে যথেষ্ট খেতে পাই নি। এখন কোনরকম একটা আশ্রয় পেলে কিছুদিনের মত খাবার ভাবনা দূর হবে, মুখও বদলাতে পারব।

দুজনে মিলে খানিকক্ষণের মধ্যেই গুটিদশেক বড় বড় ডিম সংগ্রহ করে ফেললাম। সেগুলো কোনরকমে বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়াতেই কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে চার পাঁচজন লোক কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে, আমরা কিছুই টের পাই নি। তাদের সবারই পাটকিলে পোশাক এবং হাতে একটি করে বল্লম।

নারাও প্রথম আমারই মত অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার চমক শিগগিরই ভাঙল। আগন্তুকদের একজন আমার দিকে তার সড়কি তুলে ধরতেই

সে এগিয়ে গিয়ে জলের ভেতর হাত নেড়ে কি একরকম ইঙ্গিত করলে। অন্য লোকগুলিও সেইসঙ্গে হাতের নানারকম ভঙ্গি করছিল।

অবাক হয়ে আমি তাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটির বল্লম তোলা দেখেও এবারে আমি ভীত হই নি। জলের ভেতর কথা কওয়া যায় না বলেই যে তারা হাতের এইরকম সঙ্কেত দ্বারা ভাব বিনিময় করবার পন্থা আবিষ্কার করেছে এটুকু বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু হাতের ভাষা আমি কিছুই জানি না। তাদের আলাপের বিন্দুবিসর্গও ধরবার উপায় আমার নেই।

খানিক বাদে লোকটা বল্লম নামিয়ে নিল। মনে হল যে কৈফিয়তই নারা দিয়ে থাকুক, তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের দুজন আমাদের হাত থেকে কয়েকটা ডিম তুলে নিয়ে আমাদের ভার লাঘব করে দিল।

কিন্তু এরা কারা, কোথা থেকেই বা এরা এল, কিছুতেই ঠাওরাতে পারছিলাম না। নারা বেশ প্রসন্ন মনেই তাদের সঙ্গে ফিরতে শুরু করেছিল। যেতে যেতে দেখলাম যে আমাদের নতুন সঙ্গী মাত্র তিন জন নয়, আরও বহু পাটকিলে পোশাকের বল্লমধারী লোক আশ-পাশ থেকে ক্রমশ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।

তারা যেই হোক এবং জঙ্গলের ভেতর থেকে তাদের আবির্ভাব যেমন রহস্যময়ই হোক না কেন, তারা যে আপাতত আমাদের শত্রু নয় এবং নারার যে তাদের ওপর বেশ একটু প্রভুত্ব আছে এটুকু বোঝা সহজ। তাদের অনেকেই নারার সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা করে হাত ওপরে তুলে ধরছিল। এটা এ রাজ্যের একরকম কুর্নিশ বলেই মনে হল।

আমাদের বাহনটিকে যেখানে রেখে এসেছি সেইদিকেই আমরা চলেছিলাম। সংখ্যায় আমরা প্রায় তখন জন-ত্রিশ হয়েছি। একজন পাটকিলে চিমটের মত পাতলা লম্বা একটা জিনিস মাঝে-মাঝে একটা আঙুল দিয়ে টেনে ছেড়ে দিচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার অনভ্যস্ত কানেও জলের ভেতর আমি একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অনুভব করছিলাম। এটা সম্ভবত তাদের পরস্পরকে আহ্বানের সঙ্কেত। সেই স্পন্দনের দ্বারাই আমাদের অবস্থান টের পেয়ে বোধহয় নানা দিক থেকে এরা এসে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছিল।

আধো-অন্ধকার অদ্ভুত জলের অরণ্যের ভেতর দিয়ে ছায়ামূর্তির মত আমরা আগু-পাছু চলেছি। আমাদের চারিধারে বিচিত্র বর্ণের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

যেতে যেতে আমাদের সঙ্গীদের কথা ভাবছিলাম। এতগুলি পাটকিলে পোশাকের লোকের বনের ভেতর বাস করার রহস্য কতকটা যেন পরিষ্কার হয়ে

গেল ভাবতে ভাবতে। মনে হল এরাও সম্ভবত শাদা-পোশাকীদের হাত থেকে পালিয়ে নিরুপায় হয়ে জঙ্গলের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিল। এখন নারার নেতৃত্বে কোন গোপন আস্তানায় চলেছে।

তন্ময় হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এক মুহূর্তে তীব্র আলোয় জঙ্গলের অন্ধকার কেমন করে একেবারে দূর হয়ে গেল। সার বেঁধে যারা আগে পাছে চলছিল তারা সহসা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালাবার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আলোর উৎস খোঁজবার জন্যে উপর দিকে চেয়ে দেখলাম, যে রকম যন্ত্রযানে নিজেদের অজ্ঞাতে আরোহণের পর থেকে আমার এই দুর্দশা শুরু হয়েছে সেই-রকম গুটি-পাঁচেক বিশাল গম্বুজাকৃতি যন্ত্রপোত আমাদের ঠিক মাথার ওপরে জলের মধ্যে ভাসছে। সার্চ-লাইটের মত তাদেরই তীব্র আলোয় বন আলোকিত।

বাঁ হাতে একটা প্রচণ্ড টান পড়ল। পাশ ফিরে দেখি নারা আমার হাত ধরে দ্রুতবেগে পাশের ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গীরা সেই ভয়ের মুহূর্তে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। আমি নারার উদ্দেশ্য বুঝে যথাসম্ভব তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আলোকিত জলের সীমানার বাইরে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আলোকে এড়ানো সহজ নয়। তুলোর মত নরম ঝাঁকড়া বিশাল শ্যাওলার ঝোপের ভেতর দিয়ে জল কেটে অগ্রসর হওয়াও কষ্টকর। আমার তবু চোখে-নাকে ঠুলি ছিল। নারার যে কী ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল সেই জানে! আলোকিত সীমানার বাইরে গিয়ে পড়েছি ভেবে যেই একটু নিশ্চিন্ত হয়েছি অমনি দেখি, যন্ত্রযানের সার্চ-লাইট ঠিক আমাদের অনুসরণ করে এসেছে। এবার যে বিপক্ষ দলের হাত থেকে আমরা উদ্ধার পাব এ আশা আমার ছিল না। কারণ শুধু আলো তো তারা ফেলছিল না, আলোটা তাদের শিকার লক্ষ করবার একটা উপায় মাত্র। আমাদের কয়েকজন সঙ্গী আমাদের কিছু আগেই জটলা পাকিয়ে একটা বৃহৎ শ্যাওলার ঝোপের পাশে লুকোবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সেখানে একটি যন্ত্রযানের আলো এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম, তার তলায় একটি ফুটো থেকে সরু নলের মত কয়েকটি অস্ত্র প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হল।

এত বড় একটা যন্ত্রযান থেকে খুব বড় রকমের কোনপ্রকার জলীয় বোমা বা টর্পেডো বেরুবে এইরকম আশঙ্কাই করেছিলাম। সামান্য কয়েকটা সরু নল দেখে বিস্মিতও যেমন হলাম আশ্বস্তও হলাম কতকটা। সেই সরু নলগুলির আঘাত এড়ানো এমন কিছু শক্ত নয়। এতে আর এমন কী ক্ষতি হতে পারে, ভাবলাম।

কিন্তু তখনও এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটির স্বরূপ বুঝতে পারি নি। বুঝতেও বিলম্ব

হল না। নিক্ষিপ্ত সরু নলগুলি দ্রুতবেগে জলের তলার মসৃণ কাদাতেই বিঁধে গেল। কোন প্রকার বিস্ফোরণও হল না। কিন্তু দেখলাম নলগুলি জলের ভেতর দিয়ে আসবার সময় পেছনে অসংখ্য বুদ্বুদশ্রেণীর মত কি সৃষ্টি করেছে। সেই বুদ্বুদগুলি সাবানের ফেনার মত ক্রমশই বড় হয়ে চারিধারে ছড়িয়ে যেতে লাগল। নারা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে আরো জোরে সে স্থান পরিত্যাগ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে দেখতে পেলাম, আর দেখতে পেলাম আমাদের ভূতপূর্ব সঙ্গী-দের আতঙ্ক। তারা কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। বুদ্বুদগুলি বড় হয়ে তখন তাদের ঘিরে ধরছে। প্রথম একজন হাত পা ছুঁড়ে কাতরাতে কাতরাতে টলে পড়ল। বিষাক্ত বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসলে মানুষের বুঝি ঐ রকম অবস্থা হয়। সমস্ত জল বুদ্বুদের মত পদার্থে তখন ভরে গেছে। আরো কয়েকজন আমাদের পেছনে কাতরাচ্ছিল। আমাদের কিন্তু তখন আর তা দেখবার সময় নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘন সামুদ্রিক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নারা আমাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল অত গভীর না হলে হয়ত ডুব-সাঁতারের মত করে এগিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। সৌভাগ্যের বিষয় আমরা এবার অন্ধকারেই ছিলাম। আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে যন্ত্রপোতগুলি আলো ফেলতে ফেলতে চলা-ফেরা করছিল। কখনো কোন বৃক্ষঝোপের তলায় সেঁধিয়ে কখনো তলার কাদায় সমস্ত দেহ ডুবিয়ে আমরা কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে এগুচ্ছিলাম।

এই জঙ্গলের ভেতর সব দিক আমার কাছে সমান। নারাও এর ভেতর পথ খুঁজে নিতে পারে কি না আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখলাম, আমার সন্দেহ অমূলক। সেই অন্ধকার জলের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুতে এগুতে এক জায়গায় এসে সে থামল। নিচের কাদায় অস্পষ্ট আলোয় সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম আমাদের সেই বাহনটি তখনও সেখানে স্থির হয়ে আছে। এতক্ষণে সত্যি প্রাণে একটু ভরসা হল, যে হয়ত এ-যাত্রা রক্ষা পেতেও পারি।

দুজনে ছত্রবাহু জানোয়ারটির ওপর চেপে বসবার পর নারা তার পিঠ থেকে ইস্কাবন-অস্ত্র তুলে নিল। জানোয়ারটির একদিকে সে মৃদু একটু আঘাত করেছে মাত্র, এমন সময়ে তিন তিনটি যন্ত্রপোতের সার্চ-লাইট ঘুরে এসে ঠিক আমাদের ওপর নিবদ্ধ হল। দৈব একান্ত প্রতিকূল না হলে একেবারে তীরের কাছে এসে এমন করে নৌকো বুঝি ডোবে না।

আমাদের বাহনটি অবশ্য সেই মুহূর্তে প্রবল বেগে একদিকে ছত্রবাহু নেড়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু তাতে কী হবে! শত্রু আমাদের চারিদিকে। তা ছাড়া এ তো আমাদের মহাকূর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয় যে দৌড়ের জোড়ে তাদের

ছাড়িয়ে যাব।' যন্ত্রপোতগুলির বেগ যেন অসাধারণ। শুধু তাই নয়, সেগুলি সশস্ত্র। আমাদের দেখতে পাবামাত্র শত্রুপক্ষ তাদের যন্ত্রযান চালিয়ে আমাদের লক্ষ করে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। এবারে আর সে সরু নল নয়। রীতিমত জল-গোলা। কূর্মারূঢ় শাদা-পোশাকীরা যেগুলি দিয়ে আমাদের মারবার চেষ্টা করেছিল তার চেয়ে এ গোলা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, যায়ও অনেক দূরে।

নারার চালনা-কৌশল যে কী অদ্ভুত এইবার তারও পরিচয় পেলাম। পৃথিবীর ওপর যুদ্ধের সময় সুদক্ষ এরোপ্লেন-চালক যে পটুতার সঙ্গে শত্রুব্যূহের ভেতর দিয়ে তাদের গোলা-গুলি এড়িয়ে তার বিমানপোত চালিয়ে বেড়ায়, নারার কৌশল তার চেয়ে কিছু কম নয়। সমুদ্রতলের এই নির্বোধ প্রাণীটি তার হাতের শাসনে প্রতি মুহূর্তে অসাধ্য সাধন করছিল। আমাদের চারিধারে ওপর নিচে যন্ত্রযানগুলি ঘুরে ঘুরে মারবার সুযোগ খুঁজছে। আশে-পাশে অনবরত তাদের বিস্ফোরক জল-গোলা ফেটে জল তোলপাড় হয়ে উঠেছে। তারই ভেতর কখনো ঊর্ধ্বে, কখনো নিচে, সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে, ছত্রবাহু জানোয়ারটিকে অপরূপ কৌশলে চালিয়ে, নারা তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করছিল। আমাদের বাহনটির দম দেখেও অবাক হলাম। জড় যন্ত্রের মত তারও যেন ক্লান্তি নেই। চারিধারের গোলা-গুলিতে ভয় পাওয়ার দরুন তার বেগও যেন বেড়ে গিয়েছিল। তিন-তিনটি দৈত্যের মত যন্ত্রযানের আক্রমণ এড়িয়ে আমাদের সে পালাবার চেষ্টার বর্ণনা করা কঠিন। বিশালকায় পোতগুলি ঈগলের মত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল আর আমরা ছোট পায়রার মত নানাভাবে বেঁকে চুরে, ডিগবাজি খেয়ে তাদের হাত ফস্‌কে পালাচ্ছিলাম। জলের রাজ্য মুহুর্মুহু তাদের সার্চ-লাইটে আলোকিত হয়ে উঠছে। ক্ষণে ক্ষণে তার ভেতর ফাটা গোলার তুমুল আলোড়ন উঠছে। আর ছত্রবাহু জানোয়ারটি থেকে ফস্‌কে পড়ে যাবার ভয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আমরা নানাদিকে ঘুরছি। কিন্তু এমন করে প্রবল শত্রুব্যূহের ভেতর কতক্ষণ টেকা যাবে তাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ আমাদের পক্ষে একটা শুভ ঘটনা ঘটে গেল। একটি যন্ত্রযান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা আমাদের ফস্‌কে অপর দিকে একটি পোতে গিয়ে লাগল। আমরা তখন ঘুরতে ঘুরতে আরো গভীর জলীয় জঙ্গলের ওপর এসে পড়েছি। যে যন্ত্রযানটিতে আঘাত লেগেছিল তার তলাটা সঙ্গে সঙ্গে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। নিচের যে প্যাডলের জোরে তা চলে তার কয়েকটা পাখা তখন খসে পড়েছে, প্রবলবেগে ভেতরে জল ঢুকছে। যন্ত্রযানটি ধীরে ধীরে নিচের জঙ্গলের ওপর নেমে পড়ল। তার আরোহীদের উদ্ধার করবার জন্য বাকি দুটির ভেতর একটিতে যেতে হল।

এই আমাদের সুযোগ। আমাদের বিরুদ্ধে এখন একটিমাত্র শত্রুপোত। নারা এ সুযোগ অবহেলা করলে না। আমাদের বাহন দেখলাম এবার প্রাণপণে একদিকে ছুটেছে। কিন্তু শত্রুর অনুসরণও থামল না। আমাদের দিকে তার সার্চ-লাইট নিবদ্ধ করে সমানভাবে গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসতে লাগল।

আমরা তখন গভীর সামুদ্রিক জঙ্গলের ওপর এসে পড়েছি। নিচে থেকে এতটুকু আলোও উঠছে না। অমাবস্যার রাতে তবু পৃথিবীতে তারার আলো থাকে, এখানে জল তার চেয়েও অন্ধকার। যন্ত্রযানের সার্চ-লাইটের আলো তার মাঝে অতি দীর্ঘ তলোয়ারের ফলার মত ঘুরছে। আমাদের বাহনটি এতক্ষণে বুঝি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শত্রু ক্রমশই আমাদের কাছে এসে পড়ছে বুঝতে পারছিলাম।

নারা সহসা একটা অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। শাদার সার্চলাইটের সীমার নিচে নেমে হঠাৎ সে ইস্কাবন-অস্ত্রটি জানোয়ারটির গায়ে বসিয়ে দিলে। জলের মধ্যে আমাদের বাহন পরমুহূর্তেই একেবারে স্থির হয়ে গেল। আমাদের এ কৌশল শাদা-পোশাকীরা বুঝতে পারল না। সামনের দিকেই আমরা গেছি ভেবে সেইদিকে আলো ফিরিয়ে তারা ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়েই পার হয়ে চলে গেল। বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

কিন্তু বৃথা আশা! শত্রুকে ঠকিয়ে সামনে যেতে দিয়ে আবার যেই আমরা অপর দিকে যাবার উপক্রম করেছি, সেই মুহূর্তেই দেখি না, তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কৌশল বুঝতে পেরে আমাদের দিকেই সার্চলাইট ফেলে তারা সমস্ত জল খুঁজছে।

নারা তাড়াতাড়ি ইস্কাবন-অস্ত্রটি আবার তুলে নিলে। কিন্তু একি! আমাদের বাহন যে নড়ে না! নারার মৃদু আঘাত সত্ত্বেও বার কয়েক অত্যন্ত দুর্বলভাবে তার বাহুগুলি নেড়ে সে একেবারে নিষ্পন্দ হয়ে গেল। বুঝলাম তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। এতক্ষণের ক্লান্তির পর নারার এবারের আঘাত আর সে সহ্য করতে পারে নি। এবার আর উপায় নেই। সার্চ-লাইট আমাদের খুঁজে বার করবেই এবং তারপর যন্ত্রযান থেকে যে গোলা নিক্ষিপ্ত হবে তা থেকে আমাদের আর নিস্তার নেই।

অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ আমার হাত ধরে নারা প্রবলবেগে টান দিল। জানোয়ারটির যে বাহু আমি ধরে ছিলাম নারার টানে তা থেকে হাত সরে গেল, পরমুহূর্তে অনুভব করলাম আমি আর জানোয়ারটির ওপর নেই। দ্রুতবেগে জলের তলায় নামছি। নারা আমার হাত ধরে আছে।

তখনকার অবস্থার পক্ষে নারা যে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারলাম। জলের ভেতর দিয়ে নিচে পড়া ঠিক প্যারাসুট দিয়ে এরোপ্লেন থেকে নামার মত। খুব জোরে পড়তে হয় না। নামতে নামতে ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম। শত্রুপক্ষের সার্চ-লাইট আমাদের বাহনটিকে খুঁজে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি গোলা ছিটকে এসে জানোয়ারটির দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। জলের রাজ্যের যে অপরিচিত প্রাণী আমাদের এভাবে বাঁচিয়েছে তার এই পরিণাম দেখে সত্যি ভয়ানক কষ্ট হল। মানুষের মায়া অত্যন্ত সহজেই পড়ে। মনে হচ্ছিল আমার অত্যন্ত আদরের পোষা অনুরক্ত একটি জানোয়ারের যেন মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু আমরা নামছি কোথায়? কত ঊর্ধ্বে যে আমরা ছিলাম, জলের জঙ্গল যে আমাদের কত নিচে ও সেখানে কী ভয়ানক ভাগ্য যে আমদের অপেক্ষা করছে অন্ধকারে কিছুই জানবার জো নেই। ছত্রবাহর বিনাশেও আমাদের শত্রুপক্ষ নিরস্ত হয় নি। তার ওপর আমরা নেই টের পেয়ে তারা এখনও নিচের দিকে ক্রমাগত আলো ঘোরাচ্ছিল। একসময়ে তাদের আলো নিচে গিয়ে পড়ল। সেই আলোয় এখানকার জঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয়ে চোখ বুজলাম। আমাদের প্রায় এক হাজার ফুট নিচে থেকে গভীর দুর্ভেদ্য জলের জঙ্গল মনে হচ্ছিল দ্রুতবেগে আমাদের গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ওখানে আমরা আশ্রয় পাব, না আরো ভয়ঙ্কর বিপদের হাতে পড়ব কে জানে।

বিশাল একচক্ষু দৈত্যের মত যন্ত্রযানটি তখনও আমাদের সার্চ-লাইট ঘুরিয়ে খুঁজছে।

উনিশ

বেশিক্ষণ সশঙ্কচিত্তে আমাদের অপেক্ষা করতে হল না। খানিক বাদেই তুলোর মত নরম জলজ জঙ্গলের ওপর আমরা এসে পড়লাম। ওপর থেকে দ্রুতবেগে নামবার সময় ভয় ছিল হয়ত পড়বার আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হবে। জলজ জঙ্গল অত নরম না হলে হয়ত তাই হত। কিন্তু আঘাত পাওয়া দূরে থাক, জঙ্গলের ওপর পড়ে প্রথমটা অত্যন্ত আরামই পেলাম যেন। ঠিক যেন নরম পালকের পুরু বিছানায় আমাদের ফেলে দিয়েছে।

এখানে জলজ উদ্ভিদগুলি আকারে বিশাল হলেও আমাদের ভার সহ্য করতে পারবার মত শক্ত নয়। তার ভেতর দিয়ে আমরা বলে নিচে পড়লাম। আরামের অনুভূতি দূর হয়ে এইবারই ভয়ে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এখানে অন্ধকার যে কী গাঢ় তা বলে বোঝানো যায় না। জঙ্গল এমন

ঘন যে মনে হয় এর ভেতর দিয়ে পথ করে কোনদিনই বেরোতে পারব না। এই গাঢ় আঁধারের ভেতর আধ হাত দূরেও যদি কোন ভয়ঙ্কর বিপদ থাকে তাও টের পাবার উপায় নেই ; সুতরাং যন্ত্রযানের গোলা থেকে নিষ্কৃতি পেলেও খুব সম্ভব এই জঙ্গলেই আমাদের সমাধি হবে বলেই মনে হয়।

এই জঙ্গলের যেখানে পড়েছি সেখানেই আপাতত বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করবারও নেই। এ অরণ্য কত দূর বিস্তৃত কে জানে! দিক-ভুল হয়ত নারার এর ভেতর না হতে পারে, কিন্তু আমরা আর কত দূর এই অবস্থায় যেতে পারি!

এতক্ষণের পরিশ্রমে আমাদের দুজনের শরীরই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া প্রত্যেক নিশ্বাসের টানের সঙ্গে বুঝতে পারছিলাম আমার ঠুলির নকল হাওয়া ফুরিয়ে এসেছে। মাথার ভেতর কি রকম যেন ঝিম-ঝিম করছিল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বুঝতে পারছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, নিশ্বাস নেবার যন্ত্রণা পরিপূর্ণভাবে আরম্ভ হবার আগে যেন জ্ঞানটা লোপ পায়।

কিন্তু নিশ্চিন্তে মরবার আরামটুকুও আমার ভাগ্যে নেই। জঙ্গলের যেখান দিয়ে আমরা নিচে পড়েছিলাম সেখানে এখনও একটু ফাঁক ছিল। তারই ভেতর দিয়ে হঠাৎ তীব্র আলো দেখতে পেলাম। শাদা-পোশাকীরা তাদের কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যাবার লোক নয়। আমাদের বাহনটির ওপর আমরা ছিলাম না জানতে পেরে এবং নিশ্চয় আমরা এই জঙ্গলের মধ্যে পড়েছি বুঝতে পেরে তারা আমাদের খুঁজে বার করবার জন্যে নিচে নেমে এসে জঙ্গলের ওপর আলো ফেলছে।

জঙ্গলের যে দুর্ভেদ্যতার জন্য খানিক আগে দুঃখ করছিলাম তারই জন্যে এখন ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। যন্ত্রযানের লোকেরা আমরা কোথায় পড়েছি তার অনেকটা আঁচ পেয়েছে। জঙ্গল এত ঘন না হলে তাদের সন্ধানী আলোর দৃষ্টি আমরা কোনমতেই এড়াতে পারতাম না। এখানে জলজ গাছের ঝোপের ভেতর তাদের আলো পড়লেও ওপর থেকে আমাদের খুঁজে বার করা শক্ত।

আলো দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একেবারে জঙ্গলের তলায় বসে পড়ে যথাসম্ভব আশ-পাশের ঝোপের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিলাম। যন্ত্রযানটি আমাদের ঠিক মাথার ওপর নেমে এসে ঘুরে ঘুরে চারি-ধারে আলো ফেলছিল। মনে হচ্ছিল আমাদের না পেলে তারা যেন আর নড়বে না! আমরা তাদের বড় বেশি ভুগিয়েছি বলেই যেন রাগ তাদের অত বেড়ে গেছে।

আমাদের ওপর আক্রোশ তাদের যে কী ভয়ানক, খানিক বাদে ভাল করেই টের পেলাম। ওপর থেকে আমাদের সন্ধান না পেয়ে এক সময়ে যন্ত্রযানটি দূরে সরে গেল। ভাবলাম বুঝি তারা এবার আমাদের রেহাই দেবে।

কিন্তু বৃথা আশা। নারার মুঠোর ভেতর আমার একটা হাত ছিল। হঠাৎ তার মুষ্টি শক্ত হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে দেখতে পেলাম, আমাদের মাত্র বিশ গজ দূরে জঙ্গলের উদ্ভিদগুলি থেঁৎলে ভীষণাকার যন্ত্রযানটি এবার তলাতেই নামছে। সার্চ লাইটটা এখন আর নেই বটে কিন্তু সামনের দুটি মোটরের হেডলাইটের মত বাতি আমাদের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মনে হল।

নারার হাতের টানে একেবারে তলার জলজ গুল্মের ভেতর শুয়ে পড়ে এবার আত্মগোপন করলাম। এবার তারা কী করতে চায় প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারি নি। খানিক বাদেই সন্দেহ-ভঞ্জন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা বরফের স্রোত যেন নামল। এই জঙ্গলের ভেতর সার্চ-লাইট ফেলে শিকার সন্ধান করা অসম্ভব বুঝে এবার তারা যে উপায় অবলম্বন করেছে তাতে আমাদের ধরা পড়তেই হবে। এখনই হোক বা একটু বিলম্বেই হোক এবার তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই।

যন্ত্রযানের নিচের একটি অংশ দেখলাম ফাঁক হয়ে গেছে এবং তার ভেতর থেকে হাতে টর্চ-লাইটের মত একরকম আলো ও বেঁটে একরকম সড়কি নিয়ে জন-দশেক শাসা পোশাকী বেরুচ্ছে। নিকটের সমস্ত বন সার বেঁধে খুঁজে আমাদের বার করাই যে তাদের মতলব এটুকু বুঝতে দেরি হল না। যন্ত্রযান থেকে বাইরে বেরিয়েই তারা ফাঁক-ফাঁক হয়ে দাঁড়াল, তারপর সেই ঘন বন দুহাতে ফাঁক করে এগুতে লাগল—আমাদেরই দিকে।

হাতের মশালের দ্বারা তাদের গতিবিধি আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। জঙ্গল হাজার ঘন হোক, মিনিট পাঁচেকের ভেতরই তারা যে এসে পড়বে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

নিশ্বাসের অভাবে বুকে হাঁপ ধরলেও আমি পেছন দিকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারার ব্যবহার আমায় একেবারে অবাক করে দিল। পেছন দিকে পালাবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমার হাত ধরে জোর করে টেনে আমায় শুইয়ে ফেলে সেই অবস্থাতেই বুকে হেঁটে সে শত্রুর সারের দিকেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করল। নারার যে ভয়ে মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে এ বিষয়ে এবার আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তাকে টেনে পেছু ফেরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু

তার গায়ে বল বড় কম নয়, তা ছাড়া নিশ্বাসের অভাবে আমার শরীর তখন প্রায় অবশ হয়ে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত নারার খ্যাপামিতেই সায় দিলাম। ভেবে দেখলাম যে তফাত বিশেষ কিছু নেই—পালাবার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য। আমরা এগিয়ে গিয়ে তাকে একটু আগে থাকতে বরণ করছি মাত্র। যে নারা বহুবার আমায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে, উন্মাদ হলেও তাকে ছাড়াই বা কী করে যায়! বুকে হেঁটে তার সঙ্গে আমিও এগিয়ে চললাম।

আমাদের সামনে মাত্র পাঁচ গজ দূরে একটি শাদা-পোশাকী চারিধারে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগুচ্ছিল। নারা এইবার নিচের পচা গুল্মের রাশ গভীর করে খুঁড়ে তার ভেতর নিজেকে একরকম পুঁতেই ফেলল যেন। তার ইঙ্গিতে আমিও তাই করে সর্বাঙ্গে গুল্ম ও জঙ্গলের কাদা-মাখা জঞ্জাল চাপা দিয়ে রইলাম। শাদা-পোশাকী ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে, তার টর্চের আলো দেখে তা টের পাচ্ছিলাম। আমাদের সে দেখতে পাবে না এ ভরসা করা বৃথা। তা ছাড়া এ যাত্রায় যদি না পায় ফিরে তো তারাই আবার আসবেই। তখন আমরা যাব কোথায়? নারার এই খ্যাপামির কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

শাদা-পোশাকী এবার আমাদের ঠিক উপরে এসে পড়েছে। তার একটা পা আমার ঠিক হাতের ওপরে। টর্চ-লাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ সে এদিক ওদিক দেখল। আমি কাঠ হয়ে পড়ে ছিলাম। নিস্বাসের অভাবে বুকটা ফেটে যাবার জোগাড় হচ্ছিল। তবুও এতটুকু নড়বার উপায় নেই।

শাদা-পোশাকী যখন আমাদের কাছ থেকে সামনে আরও কয়েক পা সরে গেল তখন আমার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল কত দিন রাত্রি যেন আমি এমনিভাবে শুয়ে আছি। শত্রু তখনও বেশি দূরে যায় নি। সুতরাং আরও খানিকক্ষণ এমনিভাবে পড়ে থাকতে হবে বুঝতে পারছিলাম।

হঠাৎ নারা আরও অদ্ভুত কাজ করে বসল। এতক্ষণ সন্তর্পণে বুকে হেঁটে আসার পর এ রকম করবার কী মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না। লাফ মেরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নারা আমাকেও হাত ধরে টেনে তুলল এবং দু-হাত দিয়ে বন ফাঁক করে সামনের দিকে এগুতে লাগল। জলের ভেতরও একরকম স্পন্দন হয়। যে শাদা-পোশাকী আমাদের ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল সে দেখলাম টর্চ ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। এবার সে আমাদের দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু নারার দেখতে পাওয়া না-পাওয়ায় এখন আর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে বন সরিয়ে সে দ্রুত সামনের দিকে এগুতে লাগল। কী তার উদ্দেশ্য কে জানে! আমার পা আর চলছিল না। পেছনে টর্চ হাতে

শাদা-পোশাকী আমাদের ধরবার জন্যে প্রবল বেগে এগুচ্ছে বুঝতে পারছিলাম।

কী ভাগ্যি, আমাদের অন্য শিকারীরা এ খবর পায় নি! জঙ্গলের ভেতর হাতের সড়কি ছোঁড়ার সুবিধে থাকলেও আমাদের রক্ষা ছিল না। শাদা-পোশাকীর সড়কির আঘাতেই আমাদের সব পালাবার চেষ্টা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু লোকটার সে সুবিধে নেই। মারবার অবসর পাবার জন্যেই সে প্রাণপণে এগুচ্ছিল।

কিন্তু একি! নারা স্বেচ্ছায় যে সিংহের গহ্বরেই প্রবেশ করতে চলেছে! আমাদের সামনেই এবার যন্ত্রযানের বিশাল দেহ। তার একটি স্থান খোলা। এইবার নারার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দ্রুতবেগে নারা যন্ত্রযানের সেই খোলা অংশের ভেতর ঢুকে পড়ল। আমি ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম। আমায়ও হাত বাড়িয়ে সে টেনে তুলে নিল। পেছন ফিরে দেখতে পেলাম, আমাদের অনুসরণকারী আমাদের কাণ্ড দেখে অবাক হলেও ফাঁকা পেয়ে তার সড়কি ছোঁড়বার উদ্যোগ করছে। তারপর আর কিছুই দেখা গেল না। যন্ত্রযানের দরজা বিদ্যুৎগতিতে বন্ধ হয়ে গেল।

কুড়ি

দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রথমটা অত্যন্ত ভয় পেলাম। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার মনে হল যন্ত্রযানের ভেতর শাদা-পোশাকীরাই বুঝি সুবিধে পেয়ে এইভাবে আমাদের বন্দী করলে। তারা যেন আমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল, আমরা স্বেচ্ছায় সে ফাঁদে এসে ধরা দিয়েছি। কিন্তু পরে হঠাৎ অন্ধকার কামরা আলোকিত হয়ে উঠতেই বুঝলাম এ ভয় অমূলক। নারাই কল টিপে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও আলো জেলেছে। অনেকক্ষণ আগে থাকতেই আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল বলেছি, এই জল ভরা ঘরের ভেতর নিশ্বাসের কষ্ট আরও যেন বাড়ল। বুকের ভেতরটায় অসহ্য জ্বালা করছিল। মাথাটা অনেক আগে থাকতেই তো ঝিমঝিম করছে। আমি সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে না পেরে নেতিয়ে তলায় পড়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নারা আমায় হাত ধরে তুলে আমার নাক থেকে ঠুলিটা খুলে নিলে। ঠুলি গেলে নাকের ভেতর জল ঢুকে সেই মুহূর্তেই মারা যাব এ জ্ঞান আমার তখনও ছিল। নারাকে বুঝি আমি বাধা দিতেও গেছলাম। কিন্তু ঠুলি খোলবার পর একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ পরিষ্কার তো নিশ্বাস নিতে পারছি! দু-চারবার নিশ্বাস নেওয়ার পর মাথাটা

একটু পরিষ্কার হতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। নারা আর একটি কল টেপায় ঘরের জল ধীরে ধীরে কমে এসে আমার গলা পর্যন্ত নেমেছে ; ঠুলির আর দরকার নেই।

শুধু ভাল করে নিশ্বাস নিতে পাওয়ার আনন্দ যে এত বড় হতে পারে, আমার অবস্থায় না পড়লে কেউ তা বুঝতে পারবে না। আমরা স্বেচ্ছায় একেবারে শত্রুর এলাকার ভেতর এসে ঢুকেছি—এখনো আমাদের ভাগ্যে কী আছে কিছুই জানি না ; তবু তখন মনে কোন ভয়ই আর রইল না। যা হবার হয় হোক, বুক ভরে পরিষ্কার হাওয়া যে নিতে পেরেছি এই আনন্দেই আমি তখন মগ্ন হয়ে গেছি।

দেখতে দেখতে ঘরের সমস্ত জল বেরিয়ে গেল। এবার নারা কী করবে বুঝতে পারছিলাম না। যন্ত্রযানের ভেতরকার শাদা-পোশাকীরা যে এখানে আমাদের উপস্থিতি টের পায় নি এটা ঠিক। বাইরে যারা আমাদের সন্ধানে বেরিয়েছিল তাদের পক্ষে ভেতরের লোকেদের খবর দেওয়া নিশ্চয়ই তেমন সহজ নয়। সহজ হলে এতক্ষণে ভেতরের লোকেরা আমাদের ধরবার উদ্যোগ করত। কিন্তু এই ঘরের ভেতর বরাবর বন্দী হয়ে থেকেই বা আমাদের লাভ কী! কোন এক সময়ে ভেতরের লোকেরা সন্দিগ্ধ হয়ে বাইরে তাদের যে সব সঙ্গী বেরিয়েছে তাদের খোঁজ করবার চেষ্টা করবেই, এবং তখন আমাদের আর উদ্ধার নেই।

ঘরের জল সরে যাবার পর আমরা দুজনেই নিচে বসে পড়েছিলাম বিশ্রাম করবার জন্যে। সমস্ত শরীরে তখন এমন অসীম ক্লান্তি যে নারা কিছুক্ষণ বাদে টেনে না তুললে আমি সেইখানেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়তাম। নারার কিন্তু আশ্চর্য শরীর! এইটুকু বিশ্রামেই সে যেন আবার চাঙা হয়ে উঠেছে। আমায় টেনে তোলার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। জল সরে যাওয়ায় আমাদের কথা কওয়ায় আর বাধা ছিল না। নারা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্রস্তুত হও।'

কিছু না বুঝতে পেরে বললাম, 'কেন ?'

নারা এবার যা বললে তাতে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই যন্ত্রযান আমাদের অধিকার করতে হবে। নারা বলে কী!

আকাশের চাঁদ ধরতে বললেও আমি এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম না। যন্ত্রযানটিতে কতজন লোক আছে কে জানে! তা ছাড়া যন্ত্রযানের আটঘাট না জেনে নিরস্ত্র অবস্থায় আমরা তাদের কাবু করব কী করে ?

এইসব ভেবেই আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নারা তখন কল

টিপে দিয়েছে। ভেতরের দরজা নিমেষের মধ্যে খুলে গেল। নারা আমাকে নিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল।

আগের বারেও এই জলের জগতের যন্ত্রযানকে এত ভাল করে দেখবার সুযোগ আমি পাই নি। এবার তার কল-কৌশল দেখে এ রাজ্যের বৈজ্ঞানিকদের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যন্ত্রযানের ভেতরটা ছোটখাট একটা জাহাজের খোলের মত। সঙ্কীর্ণ সোপান-পথ তার চারিধার দিয়ে উঠে নেমে গেছে। কলকব্জা সমস্ত মাঝখানে। সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথের ধারে ধারে কাঁচের মত স্বচ্ছ জিনিসের তৈরী জানলা। তার ভেতর দিয়ে সমস্ত দেখা যাচ্ছিল।

এতক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে কারুর সাক্ষাৎ হয় নি। সমস্ত যন্ত্রযান একেবারে নির্জন মনে হচ্ছিল। পা টিপে-টিপে এগুতে এগুতে একটি দরজার কাছে এসে নারা থামল। এইবার ভেতরে মানুষের আওয়াজ পেলাম। কিন্তু তারা সংখ্যায় কজন বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না। আমাকে নিঃশব্দে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে নারা দরজায় কান দিয়ে খানিক কি শুনলে কে জানে। তারপর হঠাৎ সে দরজায় ধাক্কা দিলে।

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির পাশে সামান্য একটুখানি দাঁড়াবার জায়গা। দরজায় ধাক্কা দিয়েই নারা আমার সঙ্গে সেইখানে সরে দাঁড়িয়েছিল। তার মতলব তখনও আমি বুঝতে পারি নি।

পরমূহূর্তেই দরজা ফাঁক হয়ে গেল। দুজন শাদা-পোশাকী ব্যাপার কী দেখবার জন্যেই বোধহয় দরজা মুখে এসে দাঁড়িয়ে বাইরে একবার উঁকি মারলে। নারা এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অতর্কিতে দরজার ধার থেকে বেরিয়ে সে তাদের একজনের হাত ধরে প্রচণ্ড টান মারলে। লোকটা প্রস্তুত না থাকায় সে টানে নিচু সিঁড়ি দিয়ে একেবারে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা সঙ্গীর এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে বোধহয় দরজা বন্ধ করবার উদ্যোগই করছিল কিন্তু নারা তাকে সুযোগ দিলে না। তার পেছু-পেছু সেও ভেতরে ঢুকে পড়ল।

আমি নারাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ঢোকা আর আমার হল না। অবস্থা যে এবার কী রকম দাঁড়াল তা বোঝা কঠিন নয়। এতক্ষণ একসঙ্গে আপদে-বিপদে থাকার পর এইবার আমাদের দুজনের প্রথম ছাড়াছাড়ি হল। দরজার ওপাশের শব্দ থেকে বুঝতে পারছিলাম সেখানে ভীষণ ধস্তাধস্তি চলেছে। সেখানে নারার কী অবস্থা হচ্ছে কে জানে! সাহায্য করবার আমার কোন

উপায় নেই। এদিকে যে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল সে এতক্ষণ নিজেকে সামলে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উপরে উঠে আসছিল।

শাদা-পোশাকীটার হাতে কোনপ্রকার অস্ত্র থাকলে আজকের এ কাহিনী লেখবার জন্যে আর আমায় বেঁচে থাকতে হত না। কিন্তু বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে, দেখলাম আমার মতই সে নিরস্ত্র। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হলেও আর-একটি সুবিধে আমি পেয়েছিলাম; আমি ওপরে আর সে নিচে। সে আক্রমণ করবার জন্যে ওপরে ওঠবার উপক্রম করতেই প্রচণ্ড বেগে আমি তার গায়ে একটা লাথি মারলাম। সে বেগ সামলাতে না পেরে আবার নিচে গড়িয়ে পড়ে গেল। এদিকে ভেতরে ধস্তাধস্তির শব্দ আরো প্রবল হয়ে উঠছিল। মনে হল নারার যেন চিৎকারও শোনা গেল। আমার আততায়ী নিচে পড়ে যাওয়ায় একটু সময় পেয়ে আমি সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম, যদি কোন রকমে দরজা খুলে যায়। কিন্তু সে আশা বৃথা। আমার শত্রু এদিকে দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে আবার উপরে আসছিল। এবারও আমি তাকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিলাম কিন্তু নিজে আর টাল সামলাতে পারলাম না। গড়াতে গড়াতে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তার ঘাড়ের ওপরই এসে পড়লাম।

তারপর যে মারামারি শুরু হল তাতে শেষ পর্যন্ত আমিই কাবু হয়ে আসছিলাম। ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ যুঝতে আমি পারছিলাম না। এক সময়ে আমায় বেকায়দায় পেয়ে লোকটা আমার বুকের ওপর উঠে গলাটা টিপে ধরল। আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার হাত ছাড়াতে পারলাম না। মনে হল আর বুঝি আশা নেই।

সেই মুহূর্তেই ওপরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। আমার শত্রুর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে পেলাম ক্ষত-বিক্ষত দেহে নারাই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার এ রাজ্যের সেই খাটো বল্লম। আমার নিশ্বাস বোধহয় আর একটু হলেই বন্ধ হয়ে আসত। কিন্তু তিলমাত্র বিলম্ব না করে নারা সেই বল্লম ছুঁড়ে মারলে। পরমুহূর্তেই অনুভব করলাম আমার শত্রুর হাতের মুষ্ঠি শিথিল হয়ে এসেছে। অস্ফুট চিৎকার করে সে আমার পাশে গড়িয়ে পড়ল। আমি হঠাৎ তার বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

নারা ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছিল। দেখা গেল বল্লমটা আমার শত্রুর কাঁধের বেশ খানিকটা ভেদ করে তাকে যন্ত্রণায় অবশ করে ফেলেছে। কিন্তু মারা সে পড়ে নি। ধরাধরি করে তাকে আমরা ওপরের কামরায় নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় হাত পা বেঁধে রেখে দিলাম। নারার সঙ্গে যার মারামারি হয়েছিল সে লোকটাও সেখানে পড়ে ছিল। নারা আগেই তাকে বেঁধে ফেলেছে।

যে কামরাটায় আমরা ঢুকেছি এইটেই যন্ত্রযানের আসল এঞ্জিন-ঘর। চারিধারে যন্ত্রযান চালাবার কল-কৌশল, তার সঙ্গে জলের রাজ্যের নানারকম অদ্ভুত মানচিত্র। নারা সেদিকে চেয়ে বললে, 'এবার আমরাই মালিক।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন? এখানে আর কেউ কোথাও নেই?'

নারা বললে, 'না, আমি তা জানতাম বলেই অতখানি বিপদ ঘাড়ে করেছিলাম।'

ক্ষণিক আনন্দে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। সত্যিই এই বিশাল যন্ত্রযান আমাদের অধিকারে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এবার কী করবে?'

'প্রথমে আহারের চেষ্টা,' বলে নারা আমায় নিয়ে কামরার একদিকে অগ্রসর হল। সে-ধারের ছোট একটি দরজা ফাঁক হয়ে যাবার পর দেখা গেল নিচে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি নেমে গেছে। যন্ত্রযানের আটঘাট নারার দেখলাম বেশ চেনা। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরে আমরা পৌঁছলাম তার চারিধারের শেল্‌ফে জলচর রাজ্যের নানারকম খাবার সাজানো। টবাকৃতি যে টঙে প্রথম নারার সঙ্গে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটা পাটকিলেদের বাসস্থান বলেই খাবারের ব্যবস্থা সেখানে অত্যন্ত খারাপ; এখানে যেসব খাবার দেখা গেল আগে তা কখনও চোখে পড়ে নি। যে জমানো তেল খেয়ে মুখে আমাদের অরুচি ধরে গেছল তার চেয়ে এগুলি অনেক বেশি সুস্বাদু। সে সমস্ত খাবারের আমরা যে কী রকম সদ্ব্যবহার করেছিলাম তা বোধহয় আর বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আহারের পর আমি সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন-শব্দে জেগে উঠে দেখি, কেউ কোথাও নেই। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছি, এর মধ্যে কি যে হয়েছে কিছুই জানি না। নারাকে কাছে না পেয়ে একটু ভয়ও হচ্ছিল। সুখের বিষয় শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছল। নারার খোঁজে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে দেখলাম ভয়ের কিছু নেই। আমাদের শত্রু দুজন তখনও বন্ধ অবস্থায় এঞ্জিন-ঘরের পাশে পড়ে আছে। নারা কলকব্জার সামনে দাঁড়িয়ে একটা মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছিল।

এতক্ষণ যে শব্দটা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম, বুঝলাম সেটা যন্ত্রযান চলারই আওয়াজ। নারা তাহলে যন্ত্রযান চালাবার কৌশলও জানে! কিন্তু সে চলেছে কোথায়?

আমায় দেখতে পেয়ে নারা আমায় কাছে ডাকল। তার সামনে প্রকাণ্ড একটা আয়নার মত কাঁচ বসানো। আমায় সেদিকে তাকাতে বলে নারা একটা ছোট চাকার মত কল ঘুরিয়ে দিলে। পরমুহূর্তে আয়নায় যে ছবি ফুটে উঠল

তা দেখে আমি তো অবাক! সমুদ্রতলের অপরূপ দৃশ্য আয়নায় ভেসে উঠেছে। বুঝলাম সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত যন্ত্রযান থেকে নিচের দৃশ্য দেখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আয়নার ছবি থেকে বোঝা গেল, গভীর অরণ্যের সীমা ছাড়িয়ে আমরা ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে চলেছি। আমাদের প্রায় দুহাজার ফুট নিচে থেকে উজ্জ্বল কাদার আলো উঠছে। মাঝে মাঝে দু একটা জলজ পোকা ও নানাজাতীয় মাছের ঝাঁক ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

আয়নার কৌশল দেখবার জন্যেই নারা এবার সে কলটা বন্ধ করে আর একটি চাকা ঘুরিয়ে দিলে। বুঝলাম এবার আয়নায় আমাদের চারিধারের জলের ছবি উঠেছে। সে জল প্রায় অন্ধকার। ভূতের মত ঝাপসা বিশাল আকৃতির নানাপ্রকার প্রাণী আমাদের চারিপাশ থেকে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ আর-একটি কল টিপতেই সে জল প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,—নারা সার্চ-লাইট জেলে দিয়েছে।

এই নিরাপদ আশ্রয়ের ভেতর থেকে জলের রাজ্যের সে দৃশ্য দেখবার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই অগাধ জলের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। আয়নার ছবিগুলো কোন চিত্রকরের উন্মাদ কল্পনা বলে মনে হয়।

কিন্তু সে চিত্র কত ভয়ঙ্করভাবে সত্য, অবিলম্বেই তার প্রমাণ পেলাম। আমাদের চারিধারের দৃশ্য দেখা শেষ করে আবার নারা নিচের দৃশ্য-পথ খুলে দিয়েছিল। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে ঘরের চারিধারে তাকিয়ে দেখলাম। সহসা নারার অস্ফুট চিৎকারে চমকে উঠে দেখি, আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত তন্ময় হয়ে সে কি দেখছে।

প্রথমটা আয়নায় তাকিয়ে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। হাজার ফুট নিচে জলের ওপর মনে হল একটা খুব বিশাল জলজ উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে। এতে এমন উদ্বেগের কী আছে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার পরেই দেখি নারা আমাদের যন্ত্রটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে সমুদ্র-তলের দৃশ্য ক্রমশ আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠতেই শিউরে উঠলাম। যেটাকে বিশাল জলজ উদ্ভিদ মনে করেছিলাম, সেটা ছোটখাট পাহাড়ের মত বিশালকায় একটি ভয়ঙ্কর আকৃতির জানোয়ার। খোলা-টোলা বাদ দিয়ে অনেকগুলি শামুকের শুঁড় একত্র করলে তার চেহারার খানিকটা আঁচ বোধহয় পাওয়া যায়। শুঁড়গুলি কিন্তু আগাগোড়া বড়-বড় কাঁটায় ঢাকা। সেই অজস্র শুঁড়ের সাহায্যে জানোয়ারটি দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে, আর তার সামনে প্রাণপণে জল টেনে

পালাবার চেষ্টা করছে একটি লোক। জানোয়ারটির তুলনায় তাকে একটা পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছিল।

একুশ

নারা যন্ত্রযানটিকে আরো নিচে নামিয়ে আনতেই লোকটাকেও ভাল করে দেখা গেল। মনে হল লোকটা পাটকিলে পোশাকের। নিজের জাত-ভাইকে বাঁচাবার জন্যে নারা এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঁচানো সহজ নয়। জানোয়ারটা প্রায় লোকটাকে ধরে ফেলেছে। তার দীর্ঘ শুঁড়গুলো ঠিক মাথার উপর কিলবিল করে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই লোকটা যে মারা পড়বে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যন্ত্রযানটিকে ঠিক জানোয়ারটার মাথার ওপর এনে নারা হঠাৎ কল বন্ধ করে দিলে। বুঝলাম যন্ত্রযান স্থির হয়ে গেছে। তার পরেই আমায় সঙ্গে করে দ্রুতবেগে নারা নিচের একটি ঘরে নেমে এল। এ কামরাটি যন্ত্রযানের একেবারে তলায়। চারিধারে গোলাকার ছোট ছোট জানালার মত ছিদ্র, এবং প্রত্যেক ছিদ্রের পাশে ছোট ছোট মেশিনগানের মত একটি করে অস্ত্র বসানো। আমাদের বিরুদ্ধে যন্ত্রযান থেকে যে জল-গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেইরকম গোলা একধারে স্তূপাকার করে সাজানো। এগুলিকে গোলা বলা ভুল। কারণ আসলে এগুলি টর্পেডো জাতীয়—তেমনি লম্বা লাউয়ের মতো এদের আকার। তবে টর্পেডোর চেয়ে এগুলি অনেক ছোট।

একধারের জানালার কব্জা-দেওয়া ঢাকনা সরিয়ে দিতেই সামনের সমস্ত দৃশ্য পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা গেল। সেই ভীষণ জানোয়রটা লোকটিকে ধরে ফেলেছে বললেই হয়। তিনটি ভয়ঙ্কর শুঁড় জলের ওপর উঁচু করে তুলে সে বোধহয় শিকারের ওপর পড়বার উদ্যোগ করছিল। নারা সে-দৃশ্য দেখে এক মূর্তহূ অপেক্ষা করল না। বোমা নিক্ষেপের অস্ত্রটি একটুখানি ঘুরিয়ে লক্ষ্য স্থির করে তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে দিলে। সামনের জলের আলোড়ন তুলে আমাদের ছোট টর্পেডোটি বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল।

তারপরই ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণ হয়ে জানোয়ারটার দুটো শুঁড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এই সামান্য আঘাতে সে বিশাল জানোয়ার কাবু হবে ভেবে আমি অত্যন্ত ভুল করেছিলাম। আহত হয়ে তার মূর্তি এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে কে জানত! একসঙ্গে সমস্ত শুঁড় ক্ষিপ্তভাবে আছড়ে আস্ফালন করে নিচেকার সমস্ত জল সে তোলপাড় করে তুলল। জলের সে বিপুল আলোড়নে আমাদের যন্ত্রযান পর্যন্ত দুলছিল। জানোয়ারটির শান্ত মূর্তি দেখেই ভয় পেয়েছিলাম,

তার এই ক্ষিপ্রতা দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। যন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও বুক কাঁপছিল।

ভয়ের কারণ একেবারেই যে ছিল না তা নয়, কারণ দেখলাম নারার মুখও শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার পাত্র সে নয়। টর্পেডো ছোঁড়বার অস্ত্রের লক্ষ যথাসম্ভব স্থির করে, সে পরের পর গোলা দিয়ে জানোয়ারটিকে আঘাত করতে লাগল। আমি তাকে গোলা জুগিয়ে দিতে লাগলাম।

নারার অসুবিধে অবশ্য অনেক। চালাবার লোকের অভাবে তাকে যন্ত্রটিকে থামিয়ে রেখে আসতে হয়েছে। জানোয়ারটির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রযানের গতি পরিবর্তিত করতে পারলে অস্ত্র ছোঁড়বার অনেক বেশি সুবিধে হত। দ্বিতীয়ত, জানোয়ারটির আস্ফালনে নিচের উজ্জ্বল কাদা ঘুলিয়ে উঠে সমস্ত অস্পষ্ট করে ফেলেছে। তার ভেতর জানোয়ারটিকে আঘাত করতে, আক্রান্ত লোকটির গায়ে গোলা না লেগে যায় এ বিষয়ে তাকে সর্বদাই সাবধান হতে হচ্ছিল।

যন্ত্রযানটি স্থির থাকার জন্যেই অবশ্য বিপদ আমাদের একটু বেশি হয়েছিল। এক সময়ে উর্ধ্বে দুটি শুঁড় তুলে জানোয়ারটি আমাদের যন্ত্রযানের নিচেকার প্যাডল প্রায় ধরে ফেলেছিল আর-কি! নারা উপযুক্ত সময়ে একটি গোলার আঘাত দিয়ে আসন্ন বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে। পরে শুনেছিলাম জানোয়ারটির শরীরের শক্তি এমন প্রচণ্ড যে অনায়াসে তার শুঁড়ের আকর্ষণে আমাদের প্যাডল বেঁকে, দুমড়ে খুলে আসতে পারত। এবং প্যাডেল ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জল ভেতরে ঢুকলে আমাদের নিস্তার ছিল না।

পরের পর অনেকগুলি গোলা খাবার পর জানোয়ারটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল। তার অধিকাংশ শুঁড় তখন ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে গেছে। তার দেহের ফিকে লাল শোণিতে সমস্ত জল রঞ্জিত। নারা শেষ দুটি গোলা মারবার পর, একবার অস্থিরভাবে জলের ভেতর নড়েচড়ে উঠে পাহাড়ের মত জানোয়ারটা একদম স্থির হয়ে গেল। উজ্জ্বল কাদাও তখন থিতিয়ে আসছে। দেখা গেল সৌভাগ্যক্রমে আক্রান্ত লোকটার কোন ক্ষতি হয় নি। জানোয়ারটি প্রথম আহত হয়ে আস্ফালন করবার সময় জলের ঢেউয়েই বোধহয় সে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল। সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিক বাদে যন্ত্রটি তার কাছাকাছি নামিয়ে, পাম্প-ঘর দিয়ে নারাই তাকে ভেতরে নিয়ে এল। আমি এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটি জিনিস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটির একটি হাতে একটি তাবিজের মত জিনিস বাঁধা এবং তাবিজের ঠিক মাঝখানে আমরা যে জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিলাম, তারই মার্কা-মারা একটি পেতলের বোতাম।

আমার জামা তো আমার কাছেই আছে, তার কোন বোতামও খোয়া যায় নি। এ কি তাহলে শরতের কোটের বোতাম!

এ বোতাম এ লোকটা পেল কোথায় এবং এটিকে যত্ন করে তাবিজ করে রাখারই বা অর্থ কী?

বাইশ

আমায় চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ও আমার দৃষ্টি কোন্‌দিকে নিবদ্ধ তা বুঝতে পেরে লোকটা এবার নিজেই কথা বললে।

'আমার হাতের চিহ্ন দেখে কি অবাক হচ্ছেন?'

আমি মাথা নাড়ায় লোকটা বললে, 'নিলাঙে সব পাটকিলেদের হাতেই আজকাল এই তাবিজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।'

পাহাড় কেটে তৈরি যে জলের নগরে আমাদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার নাম যে 'নিলাঙ', এইটুকু আমি এতদিনে জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকটার কথা আমার একটুও বিশ্বাস হল না। আমাদের সমুদ্রযাত্রার জাহাজের প্রথম ইংরেজি অক্ষর বোতামটির উপর স্পষ্টভাবে লেখা। এ বোতাম ও এ চিহ্ন জলের রাজ্যে কোথা থেকে আসতে পারে? এতদিন বাদে হঠাৎ পাটকিলেদের এ রকম চিহ্ন-দেওয়া তাবিজ পরবার অর্থই বা কী! সত্যি কথা বলতে কি, লোকটার ওপর আমার একটু সন্দেহই হচ্ছিল। অথচ সন্দেহটা অত্যন্ত অস্পষ্ট পরিষ্কারভাবে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

লোকটার নাম মিঙ। এমন সময়ে এ জায়গায় এসে পড়বার কারণ সম্বন্ধে মিঙ নারাকে যে বিবরণ দিলে তার ভেতরেও খুঁত ধরবার কিছু নেই।

আমরা আপাতত যেখানে ছিলাম সেটা জলের রাজ্যের খনি-প্রদেশ বলা চলে। শুনলাম এখান থেকে পেট্রোলের মত একরকম তেল পাওয়া যায়। জলের রাজ্যের সমস্ত কাজ যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, এই তেল থেকেই তা সংগ্রহ করা হয়। এই খনি-প্রদেশে পাটকিলে মজুরদের বড়-বড় কয়েকটি টঙ আছে। নিলাঙ থেকে পালিয়ে মিঙ সেই টঙের উদ্দেশেই যাচ্ছিল। পথে এই বিপদ। মিঙ যে নিলাঙ থেকে আসছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার অবশ্য কিছু ছিল না। নিলাঙের অনেক খবরই সে দিল। কিন্তু শরৎ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না দেখলাম।

আশ্চর্যের বিষয় নারা মিঙকে এতটুকু বিশ্বাস করে নি। আমি এক সময়ে একলা পেয়ে আমার সন্দেহের কথা তাকে জানালাম, কিন্তু তাতে সে হাসল মাত্র। শরতের বোতামের কথাটা তার মনে তেমন না ধরতে পারে ভেবে

আমার মনে সন্দেহের অপর যে কারণগুলো ছিল তাও তাকে জানলাম। বললাম, 'পাটকিলে হলেও ওর নাকে যে ঠুলি ছিল তা লক্ষ্য করেছ কি ?'

নারা তাতে হেসে বললে, 'তাতে কী হয়েছে! মিঙ যে বুড়ো ! পাটকিলেরা বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় জল থেকে হাওয়া টানবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন তাদের ঠুলি দরকার হয়।'

এ খবরটা সত্যি আমার জানা ছিল না। তবু আমি আবার বললাম, 'কিন্তু ওর ব্যবহার কি তোমার একটু অদ্ভুত ঠেকে নি ? তোমার মত চেহারার লোককেও এই যন্ত্রযানে দেখে যতটা আশ্চর্য মিঙয়ের হওয়া উচিত ছিল তা সে হয় নি কেন ?'

নারা এই কথাতেও হেসে বললে, 'না যদি হয়ে থাকে তাতে ওকে সন্দেহ করবার কী আছে ?'

সত্যিই ভাল করে ভেবে দেখলে সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ নেই। তার হাতের তাবিজের বোতামটিই আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল বটে। কিন্তু তার একটা অত্যন্ত সহজ ব্যাখা হয়ত থাকতে পারে। মন থেকে এ সন্দেহ আমি মুছে ফেলার চেষ্টাই করলাম। কিন্তু কী জানি কেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

খনি-অঞ্চলের ওপর দিয়ে আমাদের যন্ত্রযান এইবার চলছিল। নিচে জায়গায় জায়গায় জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু ধাতুনির্মিত দণ্ড। দু-একটা টবাকৃতি পাটকিলের টঙও চোখে পড়ল। কিন্তু সেগুলি সমস্ত পরিত্যক্ত। সেখানকার পাটকিলেরা বেশিরভাগসাদা-পোশাকীদের আক্রমণে মারা পড়েছে। যে ক-জন বেঁচেছে তারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

খনির অঞ্চল শেষ হতেই আবার ছোটখাট একটি জলজ অরণ্য দেখা গেল। এ জঙ্গলটি তেমন ঘন না হলেও শুনলাম অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। অত্যন্ত হিংস্র কয়েক জাতীয় জলচরের এইখানে আড্ডা। পারতপক্ষে এ রাজ্যের লোক এ জঙ্গলের দিকে মাড়ায় না। যন্ত্রযান ছাড়া এদিকে আসাও নাকি নিরাপদ নয়।

এই জঙ্গলের দিকে যন্ত্রযান চালাবার উদ্দেশ্য আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। তারপর প্রথম খাবারের খোঁজে যে জঙ্গলে আমরা এসেছিলাম, সেখানকার পাটকিলে সঙ্গীদের ইসারার কথা আমার মনে পড়ল। মনে হল তারা হয়ত তখন এই জঙ্গলের কোন গোপন আড্ডার কথা ইসারায় নারাকে জানিয়ে থাকবে। বাধা না পড়লে দলবল নিয়ে তখন আমরা হয়ত ঠিক এইদিকেই আসতাম।

আমার অনুমান যে ঠিক, খানিক বাদেই তা বোঝা গেল। জঙ্গলের একটা

জায়গা অত্যন্ত ঘন মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে দুটি জলজ গাছ সেখানে অত্যন্ত উঁচু হয়ে অরণ্যের মধ্যে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। জলজ জঙ্গলে এত উঁচু কোন গাছ আগে দেখিনি। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সেদুটি গাছ নয়। ভাঙা একটি জাহাজের মাস্তুল জলজ উদ্ভিদে জড়িয়ে গেছে। নারার যে এইটিই লক্ষ্য এ বিষয়ে আর সন্দেহ করবার কিছু ছিল না।

এ জাহাজটি কবে ওপরের সাগর-জলে ডুবে গেছল কে জানে? আপাততঃ সমুদ্রতলে বিকৃত ভগ্ন অবস্থায় জলজ শ্যাওলা ও গুল্মে আচ্ছাদিত হয়ে তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মাস্তুলদুটি না থাকলে জাহাজ বলে তাকে আর চেনবার উপায় ছিল না। ঘন একটা বিশাল জলজ ঝোপ বলেই মনে হত।

আমাদের যন্ত্রযান ধীরে ধীরে সেই জাহাজের উর্ধ্বে এসে থামল। নারা একটি হাতল ঘুরিয়ে সেটিকে নিচে নামাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটে গেল। নারার মুখ দেখে বুঝলাম সে এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ঝোপে ঢাকা সেই জাহাজের ভেতর থেকে সহসা জল গোলা ছুটে এসে আমাদের অত্যন্ত নিকটে ফেটে গেল।

নারা প্রথমটা একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও পরমূহূর্তে নিজেকে সামলে যন্ত্রযানটিকে নিচে না নিয়ে গিয়ে আরো একটু ওপরে চালিয়ে দিলে। আমরা ওপরে ওঠবার আগেই অবশ্য আরো অনেকগুলি গোলা আমাদের চারিধারে এসে ফেটে গেছে। একটির আঘাতে আমাদের যন্ত্রযানের নিচের প্যাড্‌ল্ তো আর-একটু হলে চূর্ণ হয়ে যেত।

যথাসম্ভব সে গোলার নাগালের বাইরে যন্ত্রযানটিকে তুলে নারা নিচের সার্চ-লাইট জ্বেলে দিলে। ব্যাপারটা যে কী তা এবার আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। কেন যে এ কথা আগে আমার ও নারার মনে হয় নি এই ভেবেই এখন অবাক হলাম। এই নিমজ্জিত জাহাজটিই পলাতক পাটকিলেদের গোপন দুর্গ।

তাদের এই গোপন আড্ডার ওপর যন্ত্রপোত আসতে দেখে ভীত হওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ যন্ত্রযান যে তাদের শত্রুপক্ষের নয় এ কথা তারা কেমন করে বুঝবে? তারা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে তাদের গোপন আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে শাদা-পোশাকীরাই তাদের আক্রমণ করতে এসেছে।

এই গোপন স্থান রক্ষা করবার জন্যে তারা কী রকম ব্যাকুল তা পরক্ষণেই বোঝা গেল। সেই নিমজ্জিত জাহাজের ভেতর থেকে যে শুধু গোলাই ছুটতে লাগল তা নয়, দেখলাম সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে কয়েক দল পাটকিলেও বেরিয়ে পড়েছে। কেমন করে কে জানে, তারা বাহন-স্বরূপ কয়েকটি মহাকূর্ম ও ছাতা-জানোয়ার জোগাড় করেছে। সেই বাহনের পৃষ্ঠ থেকে আমাদের যন্ত্রযানের

অত্যন্ত দুর্বল দুটি স্থান—অর্থাৎ নিচের ও পাশের প্যাড্‌ল লক্ষ করে তারা ছোট জলবন্দুক ছুঁড়তে লাগল।

আমরা যে অত্যন্ত মুস্কিলে পড়লাম এ কথা বলাই বাহুল্য। নিজের দলের লোকের বিরুদ্ধে নারা গোলা-গুলি কেমন করে ছোঁড়ে! অথচ তাড়াতাড়ি একটা কিছু উপায় না করতে পারলে পাটকিলেদের আক্রমণে আমাদের যন্ত্রযান বিকল হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। আমি নিজে তো বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন সহজ উপায় দেখতে পেলাম না।

পাটকিলেদের আক্রোশ ও উত্তেজনা বেশি না হলে তারা হয়ত লক্ষ্য করত যে তাদের বিরুদ্ধে যন্ত্রযান থেকে একটি অস্ত্রও নিক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্তু তখন তারা একরকম উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাদের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে তারা অবিশ্রান্তভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। তাদের ব্যাপার দেখে মনে হল এ বিপদে আত্মরক্ষার জন্যেই হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের আঘাতের জবাব না দিয়ে পারব না। মিঙ তো বিরক্ত হয়ে নারাকে সেইরকম বোঝাচ্ছিল।

নারা কিন্তু তখন তার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে। এই আক্রমণের কোনরকম প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা না করে অত্যন্ত ধীরভাবে সে সার্চলাইট নিচের জলে ঘোরাচ্ছিল। দেখলাম তার সার্চলাইট ঘোরানো মোটেই এলোমেলো নয়। কয়েকবার লক্ষ্য করবার পর বোঝা গেল সার্চলাইটের আলো তার একইভাবে বার-বার নিচের জলের ওপর ঘুরছে। একটা যেন চিহ্ন সার্চলাইটের দ্বারা সে জলের ওপর আঁকতে চায়। চিহ্নটি অনেকটা ইংরিজির 'ডবলিউ'-এর মত।

এ চিহ্ন তাদের কতক্ষণ নজরে পড়ত কে জানে! সেই অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে হয়ত আমাদের যন্ত্রযান আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে—আমার এইরকম ভয়ই হচ্ছিল। পাটকিলেরা যেভাবে আমাদের প্যাডল লক্ষ করে গুলি-গোলা ছুঁড়ছিল তাতে যে-কোন মুহূর্তে আমাদের যান ভেঙে যেতে পারত।

কিন্তু খানিক বাদে আমরা যে তাদের আঘাত করবার কোন চেষ্টা করছি না, এটি বোধহয় তাদের নজরে পড়ল। জাহাজ থেকে গোলা ছোঁড়া হঠাৎ দেখা গেল বন্ধ হয়ে গেছে। দুজন পাটকিলে একটি ছাতা-জানোয়ারে চড়ে আমাদের যন্ত্রপোতটি বার-দুই প্রদক্ষিণ করে গেল, অথচ কোনপ্রকার গুলি ছোঁড়বার চেষ্টা করলে না। তারা বোধহয় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল।

এবার সময় হয়েছে বুঝে নারা যন্ত্রটিকে ধীরে ধীরে আবার নামাতে শুরু করলে। কিন্তু পাটকিলেদের সন্দেহ তখনও একেবারে যায় নি। যন্ত্রযানটি নামাবার উদ্যোগ করতেই এটা শত্রুপক্ষের নতুন একটা চাল মনে করে আবার

তারা গোলা-গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে। বাধ্য হয়ে নারাকে আবার ওপরে উঠতে হল।

এবার নারাও দেখলাম বেশ একটু বিচলিত হয়েছে। আমরা যে কোনরকম অনিষ্ট করতে নয়, বন্ধুভাবে তাদের সাহায্যের জন্যেই এসেছি এ কথা পাটকিলেদের বোঝাবার কোন উপায়ই সে বোধহয় খুঁজে পাচ্ছিল না। এত কষ্টে একটি যন্ত্রযান সংগ্রহ করে এসে ফিরে যাওয়া যায় না। অথচ এগুতে গেলেই বিপদ।

মিঙ উত্ত্যক্ত হয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছিল। নারা শেষ পর্যন্ত হয়ত তার কথাতেই রাজি হত। কিন্তু পাটকিলেদের হঠাৎ সুবুদ্ধি হল। আমিই লক্ষ করে দেখলাম জাহাজ থেকে তারা একটা সার্চলাইটের আলো উর্ধ্বে জলের ওপর ঘোরাচ্ছে। তাদের আলোর সাঙ্কেতিক চিহ্নও ইংরিজি ডবলিউ এর মত।

নারার দৃষ্টি আমি তৎক্ষণাৎ সেইদিকে আকর্ষণ করলাম। এ সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ আমি জানি না, কিন্তু দেখলাম নারার মুখ তাতে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তারপর খানিক সার্চলাইটের ভাষায় উভয় পক্ষে কি কথা হল কে জানে। শুধু আবার যখন নারা যন্ত্রযানটিকে নিচে নামালো তখন পাটকিলেরা কোনপ্রকার আক্রমণের চেষ্টাই করল না দেখলাম।

তেইশ

পাটকিলেদের শেষ পর্যন্ত আমাদের সদুদ্দেশ্য বোঝাতে পেরে আমরা বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। নারাও যন্ত্রপোত থামিয়েই উত্তেজিতভাবে তাড়াতাড়ি পাম্প-ঘরে নেমে গেল। আমিও তার পেছু পেছু গেলাম। পাম্প-ঘর দিয়ে বাইরের জলে বেরুতেই বহু পাটকিলে আমাদের ছেঁকে ধরল। নারাকে দেখে, বিশেষত সে একটা যন্ত্রযান জয় করে এনেছে দেখে তাদের উৎসাহ আর ধরে না। তারা একরকম সমারোহ করেই জাহাজের গোপন আড্ডায় আমাদের নিয়ে গেল।

জাহাজটিকে দেখলাম তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রয়োজনমতবদলে গড়েছে। জলজ ঝোপের আড়ালে তাদের ভেতরে ঢোকবার পাম্প-ঘর অতি সুকৌশলে লুকোনো। বাইরে থেকে কিছু টের পাবার জো নেই। জাহাজের একধারে নকল হাওয়া তৈরি করবার কল। সেটিও প্রচ্ছন্ন। জাহাজের ভেতরটা একদম নতুন করে তৈরি। সেখানকার ঘরগুলি জল ঢুকতে না পারে এমনভাবে

আঁটা। কয়েকজন পলাতক পাটকিলে কিছুদিনের মধ্যে এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার গড়ে তুলেছে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম।

পাম্প-ঘরের ভেতর দিয়ে জাহাজের বড় ঘরে ঢুকে মনে হল আমি একটা বড় যুদ্ধের কারখানায় এসে পড়েছি। চারিধারে স্তূপাকার জল-বন্দুক, দু-একটা জল-কামান ও নানাপ্রকার ছোটখাট অস্ত্র। সশস্ত্র হয়ে বিস্তর পাটকিলে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম পাটকিলেরা তাদের লাঞ্ছনার শোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। সংখ্যায়ও তারা কম নয়। অত বড় জাহাজের খোলেও তাদের স্থান-সঙ্কুলান হচ্ছে না মনে হল।

আমাদের অভ্যর্থনা করতে কয়েকজন পাটকিলে এগিয়ে এসেছিল। পোশাকের বিশেষত্ব দেখে তাদের একজনকে এখানকার সর্দার বলে মনে হল। একটি যন্ত্রযান দখল করে নারা পাটকিলেদের যে অত্যন্ত উপকার করেছে সে কথা জানিয়ে লোকটা নারাকে অনেক ধন্যবাদ দিল। বুঝতে না পেরে আমাদের বিরুদ্ধে তারা যে গোলা ছুঁড়েছিল তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করলে। ভেবেছিলাম আমার সম্বন্ধে কোন কথা হয়ত সে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু তার সে রকম কোন কৌতূহল দেখা গেল না। আমাদের জন্যে একটি আলাদা ঘর বন্দোবস্ত হয়েছিল জাহাজের একধারে। সেইদিকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সর্দার পাটকিলেদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নারার সঙ্গে আলোচনা করছিল। শুনলাম কিছুক্ষণ বাদেই তাদের এক বিশাল সভা বসবে। নিলাঙের থেকে একজন পাটকিলে পালিয়ে এসে সম্প্রতি তাদের সঙ্গে জুটেছে। তার কাছে নিলাঙের অবস্থা শুনে সভায় পাটকিলেদের কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। নিলাঙ থেকে পলাতক পাটকিলের কথা উঠতেই আমার মিঙের কথা মনে পড়ে গেছল। আমাদের বন্দী দুজন শাদা-পোশাকীও যে যন্ত্রপোতে আবদ্ধ হয়ে আছে সে কথাও আমার সেইসঙ্গে স্মরণ হয়েছে। যতদূর সম্ভব মনে করে দেখলাম, মিঙ আমাদের সঙ্গে যন্ত্রপোত থেকে বেরোয় নি। আমরা তখন বাইরে বার হবার আনন্দে এমন মত্ত যে মিঙের অনুপস্থিতি লক্ষ্যও করিনি। কিন্তু মিঙের আমাদের সঙ্গে না আসার কারণ কী? সে গেল কোথায়?

নারার হাত ধরে টেনে আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, 'নারা, মিঙ কোথায়? সে তো আমাদের সঙ্গে আসে নি!'

আমার উত্তেজনা দেখে সর্দার ও নারা দুজনে অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সর্দার নারাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মিঙ কে?'

নারা সর্দারকে যথাসম্ভব মিঙের উদ্ধার-বৃত্তান্ত জানিয়ে আমায় বললে, 'তোমার

এখনও সন্দেহ যায় নি দেখছি! মিঙ এতক্ষণ কোন এক দলে মিশে ফুর্তি করছে হয়ত। আমাদের সঙ্গে আসার তার কী দরকার আর!'

কিন্তু আমি এ কথায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না। বললাম, 'কিন্তু তাকে যে যন্ত্রপোত থেকে বেরুতেই দেখি নি।'

নারা একবার হাসল, কিন্তু সর্দার বললে, 'সন্দেহ যদি হয়ে থাকে তার মীমাংসা করে ফেলাই ভাল। আমি মিঙ কোথায় আছে খোঁজবার ব্যবস্থা করছি।

একজন পাটকিলে সৈনিককে ডেকে সর্দার মিঙকে খুঁজে আনবার আদেশ দিলে। নারার কাছে মিঙের চেহারার বর্ণনা শুনে নিয়ে সৈনিকটি চলে গেল।

আমার সন্দেহ যে অতখানি সত্য বলে প্রমাণিত হবে তা আমিও আশা করিনি। আমরা ঘরে গিয়ে বসবার খানিক বাদেই একজন সৈনিক এসে খবর দিলে যে মিঙ বলে কাউকে জাহাজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে চেহারার বর্ণনা নিয়েছি সেরকম চেহারার কোন লোকও জাহাজে নেই।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! এ সংবাদে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আমরা উঠে পড়তেই আর-একজন এসে খবর দিলে যে যন্ত্রযান থেকে আমাদের বন্দী শাদা-পোশাকীদের যারা ধরে আনতে গেছল তারা শুধু হাতে ফিরে এসেছে। যন্ত্রযানে কোন শাদা-পোশাকী নেই।

মিঙ ও আমাদের বন্দী শাদা-পোশাকীরা যন্ত্রযান থেকে পালিয়েছে খবর পাওয়ামাত্র সমস্ত ডুবো-জাহাজে সাড়া পড়ে গেল। আমার সন্দেহে গোড়ায় কর্ণপাত করে নি বলে নারার তখন আর আফশোসের সীমা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করবার প্রতিদানে মিঙ আমাদের এমন সর্বনাশ করবে কে জানত! কিন্তু শুধু আফশোসে তো আর ফল হবে না! মিঙ ও শাদা-পোশাকীরা পালিয়ে নিলাঙে গিয়ে পৌঁছবার আগেই তাদের ধরতে হবে। না ধরতে পারলে পাটকিলেদের কোনমতেই আর রক্ষা নেই।

মিঙ যে শাদা-পোশাকীদের গুপ্তচর এ বিষয়ে এখন আর কারও সন্দেহ ছিল না। বোঝা গেল যে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ শাদা-পোশাকীদের বাঁধন খুলে দিয়ে সে তাদের নিয়ে নিলাঙের দিকে রওনা হয়েছে। শাদা-পোশাকীদের আমাদের ঘাঁটির খবর যদি তারা একবার দিতে পারে তাহলে আর পাটকিলেদের উপায় থাকবে না। অগুনতি যন্ত্রযান এসে পাটকিলেরা প্রস্তুত হবার আগেই তাদের এই গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করে দেবে। সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মিঙ ও তার সহচরেরা এই বিপদসঙ্কুল অরণ্য পার হয়ে নিলাঙে পৌঁছবার আগেই তাদের রাস্তায় ধরে ফেলা। কী ভাগ্যি, মিঙ যন্ত্রযান-সমেত পালাবার চেষ্টা করে নি! অবশ্য তাদের তাতে উদ্দেশ্য-হানির

সম্ভাবনা ছিল। গোলমালের ভেতর তিনটে লোকের পালিয়ে যাওয়া যত সহজ একটা গোটা যন্ত্রযান নিয়ে উধাও হওয়া তত সহজ নয়। যন্ত্রযান নড়লেই পাটকিলেদের সন্দেহ হত এবং তখন পাটকিলেদের আক্রমণ এড়িয়ে পালানো সম্ভব হত না। আর সম্ভব হলেও পাটকিলেরা তখন নিজেদের বিপদ বুঝতে পারত। গোপনে গোপনে শাদা-পোশাকীদের খবর দিয়ে আনা মিঙ ও তার সহচরদের পক্ষে সম্ভব হত না। মিঙ যে এইসব কথা ভেবেই যন্ত্রযানটিকে ফেলে লুকিয়ে পালিয়েছে এটুকু বোঝা গেল। এতক্ষণে সে কতদূর গিয়ে পড়েছে কে জানে! নিলাঙে পৌঁছবার আগে তাকে ধরতে পারার ওপর পাটকিলেদের জীবন-মরণ সমস্যা নির্ভর করছে।

আমাকে কোনমতে তার সঙ্গে নারা নিলে না। আমায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডুবো-জাহাজে রেখে কয়েকজন পাটকিলেকে নিয়ে মিঙ ও তার সহচরদের খোঁজে নারা বেরিয়ে গেল। তারা বেগবান দুটি ছাতা-জানোয়ারে চড়েই রওনা হল দেখলাম। খোঁজ নিয়ে এইটুকু জানা গিয়েছিল যে পাটকিলেদের কোন বাহন শত্রুরা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে নি। সেইদিক দিয়ে তাদের একটু অসুবিধেই ছিল। শুধু যে এই জলজ অরণ্যটি হিংস্র কয়েক প্রকার জলজ প্রাণীর অত্যাচারের দরুন তাদের পক্ষে বিপদসঙ্কুল তা নয়, পদব্রজে তাদের পক্ষে শীঘ্র বেশি দূর অগ্রসর হওয়াও শক্ত। তবে নারাদের পক্ষে অসুবিধের কথা এই যে শাদা-পোশাকীরা কোন্ পথে পালিয়েছে তা তাদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়; দ্বিতীয়ত, এই অরণ্যের ঝোপের ভেতর তারা লুকিয়ে থেকে নারাদের সন্ধান ব্যর্থ করতেও পারে।

নারার দল ছাতা-জানোয়ারে চড়ে তীরবেগে বেরিয়ে যাবার পর আমরা উদ্বিগ্নভাবে আবার ডুবো-জাহাজে ফিরে এলাম। এইবার নারার অভাবে এই সমস্ত অপরিচিত পাটকিলেদের ভেতর আমি কেমন নিজেকে অসহায় বলে অনুভব করছিলাম। সর্দার অবশ্য আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহারই করছিল। শাদা-পোশাকীদের পালানোর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার আলোচনা করার জন্যে তখন পাটকিলেদের একটি সভা আহূত হয়েছে সর্দার আমায় সে সভায় আসতে বলে নিজের কাজে চলে গেল। আমি খানিক বিশ্রামের আশায় আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে গেলাম।

কিন্তু বিশ্রাম করতে পারলাম না। মন তখন আমার অত্যন্ত চঞ্চল। মিঙ ওপক্ষের গুপ্তচর এ কথা প্রমাণ হবার পর শরৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমার অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা হবার আশা অবশ্য এ জীবনে আমার আর ছিল না, কিন্তু তবু সে নিরাপদে আছে জানতে পারলে খুশি

হতাম। মিঙের কবচে শরতের বোতাম দেখা অবধি সে সম্বন্ধেও আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

এদিকে এই অপরিচিত পাটকিলেদের ভেতরও আমার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। এদের অধিকাংশ লোকই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তার প্রমাণ আমি ভাল করেই এইটুকু সময়ের মধ্যে পেয়েছি। একটি লোককে বিশেষ করে আমার খারাপ লাগছিল। আমার উপর অকারণে তার যেন একটা বিশেষ আক্রোশ জন্মেছে। এর মধ্যে বহুবার লোকটাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আমার দিকে চাইতে আমি দেখেছি। আমি এ-ঘরে আসবার সময়ও অনেক দূর পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে অবশেষে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে সে সরে গেছে।

লোকটার আমার প্রতি আক্রোশ হবার অবশ্য কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত তার সঙ্গে কোথাও আমার দেখা হয়নি। তার কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হওয়া সম্ভবও নয়। তবু তার এই বিদ্বেষের কারণ কী? কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিলাম। লোকটার চেহারা অত ভীষণ বলেই বোধহয় আমার ভয় অত বেশি করছিল। একে তো পাটকিলেদের মুখ আমাদের চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখায়, তার ওপর কোন একটা দুর্ঘটনায় লোকটার কপাল থেকে নিচের চিবুক পর্যন্ত কেটে যাওয়ায় তার মুখটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। লোকটার বিষয় সর্দার ও নারাকে বলব কি ভাবছি এমন সময় একটি জিনিস দেখে অবাক হলাম। আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে একটি বিছানা আর একটি টেবিল ছাড়া আর কিছু আসবাবপত্র ছিল না। আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন ঘরের আসবাবপত্র আমি ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু এখন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম টেবিলের ওপর ছোট একটা কৌটোর মত জিনিস রয়েছে। কৌতুহলী হয়ে আমি কৌটোটা খুলে ফেললাম। কৌটোর ভেতর পাকানো একটুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। কাগজটায় কি যেন লেখা ছিল, কিন্তু নিলাঙের কথা বুঝতে পারলেও তাদের লেখা অক্ষর এখনও আমি চিনি না। কৌটোর চিঠির কোন অর্থই আমি বুঝতে পারলাম না। কী উদ্দেশ্যে আমাদের ঘরে কে কৌটোটা দিয়ে গেছে তাও জানতে পারা গেল না।

চব্বিশ

খানিক বাদেই ডুবো-জাহাজে প্রবলবেগে ঘণ্টা বেজে উঠল। এটা সভা আরম্ভের ঘণ্টা বুঝে ঘর থেকে আমি বেরুতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দরজার কাছ থেকে দ্রুতবেগে সেই পাটকিলে সরে গেল। আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে কী করছিল কে জানে? রহস্যটা ক্রমশই গভীর বলে মনে হচ্ছিল। এই সময়ে নারার অভাবটা বিশেষ করে অনুভব করছিলাম।

ডুবো জাহাজের মাঝখানের সেলুনটা বেশ প্রকাণ্ড। দেখলাম ইতিমধ্যেই সেখানে বিস্তর পাটকিলে এসে জড় হয়েছে। সর্দার আমায় দেখতে পেয়ে সভার মাঝখানে তার কাছে ডেকে নিল। দেখলাম সেই মুখ-কাটা পাটকিলে লোকটাও সভার এক জায়গায় গিয়ে আসন নিয়েছে। কৌতূহল আর দমন না করতে পেরে আমি সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও লোকটা কে বলতে পারেন?'

সর্দারও দেখলাম ভাল করে তাকে চেনে না। একটু ভেবে বললেন, 'দূর-দূরান্তর থেকে অনেক খনি, অনেক কারখানার মজুর এসেছে। সবাইকে তো চিনি না! ও লোকটি কাল কোন দূরের খনি থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।'

সর্দার তারপর একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু হঠাৎ ওর খোঁজ কেন?'

কি জানি কেন সর্দারকে সব কথা বলতে আমার কুণ্ঠা হল। বললাম, 'না, এমন কিছু নয়।'

সর্দার তখন সভার চিন্তায় ব্যস্ত বলেই বোধহয় আর কিছু প্রশ্ন করলেন না।

পাটকিলেদের জরুরি সভা তারপর আরম্ভ হল! সভার আসল উদ্দেশ্য বর্তমান বিপদে পাটকিলেদের কর্তব্য স্থির করা। সর্দার নিজে উঠে প্রথমেই অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন। পাটকিলের সর্দারের বক্তৃতা থেকে নতুন কিছু শিখল কি না জানি না, কিন্তু জলের রাজ্যের অনেক রহস্য আমার কাছে প্রথম এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল। এ সভায় উপস্থিত থাকা সত্যিই আমার সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছিল।

সর্দার প্রথমেই শাদা ও পাটকিলেদের সম্বন্ধ বোঝবার জন্যে নিলাঙের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়ে দিলেন। আমাদের মতই জলের রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণের আজগুবি গল্পে আচ্ছন্ন। কবে নাকি সব মানুষ পৃথিবীর ওপর পরম সুখে বাস করত। তখন দেশে পাপ ছিল না, তাই মানুষের হাত-পাও জোড়া ছিল না। পাটকিলেদেরও গলায় কানকো ছিল না। এইখানে একটা কথা বলি। পাটকিলেদের সম্বন্ধে গোড়ায় না জেনে আমি কয়েকটা ভুল

করেছিলাম। তাদের নাকের গড়ন মানুষ ও শাদা-পোশাকীদের তুলনায় একটু অন্যরকম হলেও জল থেকে হাওয়া নেবার তাদের ঐ পথ নয়। তারা ঘাড়ের দুধারের কান্‌কোর মত দুটি জিনিস দিয়েই জল থেকে বাতাস নেয়। তাদের আঁটা জামার অদ্ভুত বুনুনির জন্যে এই ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছল। পরে জেনেছি শাদা-পোশাকীদের সঙ্গে তাদের আসল তফাত এইখানে। ঘাড়ের ধারে এই ধরনের মাছের কান্‌কোর মত যন্ত্র ভূমিষ্ট হবার আগে পৃথিবীর শিশুদেরও থাকে, তবে পৃথিবীর ওপরকার হাওয়ার এই যন্ত্রটি দরকার হয় না বলে শিশু ভূমিষ্ট হবার আগে এ জিনিসটির চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। পাটকিলেদের কিন্তু তা হয় না।

এখন, সর্দার যা বললেন তাই জানাই। সেই তখনকার স্বর্গে দুই ভাই রাজত্ব করত। তাদের মুখে ভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে ছিল হিংসা। সেই হিংসার ফলেই তাদের ঝগড়া বাধে এবং জল ও আকাশের দেবতা ঝগড়া মেটাবার জন্যে যে বেশি অপরাধী তাকে জলের রাজ্যে নির্বাসিত করেন। সেই থেকে মানুষ জলের রাজ্যে বাস করছে। ভায়ে ভায়ে মিল না হলে তাদের এ নির্বাসন আর শেষ হবে না। নিলাঙের এই পুরাণের গল্প থেকে বোঝা যায় যে সত্যিই বোধহয় একদিন পাটকিলে ও শাদারা একসঙ্গে জলের ওপর কোন দ্বীপে বাস করত। তখন তাদের মধ্যে প্রভেদ ছিল না। কোন কারণে সেই দ্বীপ ধীরে ধীরে সমুদ্রে ডুবতে থাকে। তখন বিপদ বুঝে তখনকার লোকেরা দ্বীপের ওপরকার একটা বড় পাহাড় খুদে তার ভেতর নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে। দ্বীপটা একেবারে সমুদ্র-গর্ভে ডুবে যাওয়ার পরও এই ফোঁপরা পাহাড়ের ভেতর তাদের অনেক দিন কাটে। কিন্তু তারপর ক্রমশ লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে নিলাঙ অর্থাৎ সেই ফোঁপরা পাহাড়ে স্থানের অভাব হয়। খাদ্যেরও তখন একটু একটু টান পড়েছে। সেই সময়ে সাহস করে যারা পাহাড়ের কবর কেটে বাইরে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়বার একটু একটু করে চেষ্টা করে তারাই পাটকিলেদের পূর্বপুরুষ।

পঁচিশ

বাইরের জলে বেরুবার পর থেকে নিলাঙের আহারের সমস্যা ঘুচে যায়, ধীরে ধীরে নিলাঙের উন্নতি হতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ উন্নতির যারা মূল, চক্রান্ত করে নিলাঙের তখনকার অধিপতিরা তাদের দাবিয়ে রাখে। সমুদ্রের জলে বেরুবার দরুন ধীরে ধীরে বহু যুগ ধরে পাটকিলেদের দেহে নানা পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তাদের জল থেকে নিশ্বাস নেবার ক্ষমতা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

সমুদ্রের জলের অধিকাংশ কাজ তাই তারাই করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই কাজ করবার ফলে তাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, নিলাঙের বড়লোকদের অবিচারে তাদের ক্ষতিই হয়। পাটকিলেরা ধীরে ধীরে তাদের অধিকাংশ অধিকার হারিয়ে বসে। আজ জলের রাজ্যের সমস্ত কাজ পাটকিলেরাই করে। দূর দুর্গম বিপদসঙ্কুল জলজ জঙ্গলের মাঝে তারাই খনির ভেতর থেকে তেল তোলে, নিলাঙের নকল হাওয়ার কারখানায় তারাই কাজ করে। সত্যি কথা বলতে কি, নিলাঙের সমস্ত অধিবাসীকে তারাই নিজেদের জীবন ও পরিশ্রম দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ সেই উপকারের প্রতিদান তারা শুধু অবজ্ঞা, অপমানই পেয়ে আসছে। শাদা-পোশাক উচ্চবর্ণের প্রতীক—পাটকিলে পোশাকীদের তা পরা পর্যন্ত বারণ। তারা এই অবিচারের বিরুদ্ধে কয়েকবার প্রতিবাদ করে কোন ফল হয় নি। নিলাঙের যারা কর্তা তারা তাদের কথা তো শোনেই নি বরং অত্যাচারের মাত্রা বেশি করে বাড়িয়েছে। পাটকিলেরা কারুর কোন ক্ষতি করতে চায় না, তারা চায় নিজেদের উন্নতি করবার অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার চাইতে গিয়ে তারা শুধু মারই খেয়েছে। এবার তাই সমস্ত জলের রাজ্যে ঘরোয়া বিবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। এই ঘরোয়া যুদ্ধে কত পাটকিলে যে মরেছে তার সংখ্যা নেই। কিন্তু তবু তারা বশ্যতা স্বীকার করে নি। অনেক কষ্টে তারা এই গোপন আড্ডাটি সংগ্রহ করেছে। এখানে তারা যে কয়শত পাটকিলে আছে তাদের উপরই সমস্ত নিলাঙের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এবার নিলাঙের স্বার্থপর দলের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে ভাল করে বাঁচবার অধিকার পাটকিলেদের আদায় করতেই হবে।

সর্দার এই পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়েছে, এমন সময় পেছনের দিকে একটা হট্টগোল উঠল। পেছনের পাটকিলেরা তখন উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠেছে। তাদের গোলমালে প্রথমটা কিছুই বোঝা গেল না। তারা একটু শান্ত হলে দেখা গেল, ভিড় সরিয়ে নারা ও তার অনুচরেরা এগিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে বন্দী দু-জন শাদা-পোশাকী!

নারা সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই সর্দার থেকে আরম্ভ করে সভার সমস্ত পাটকিলে উল্লাসে নারার জয়ধ্বনি করে উঠল। কিন্তু নারা হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখন আমাদের উল্লাসের সময় নয়। শাদা-পোশাকীদের আমরা ধরতে পেরেছি বটে, কিন্তু গুপ্তচর মিঙের কোন সন্ধান আমরা পাইনি। এতক্ষণে সে আমাদের কী সর্বনাশ করেছে কে জানে!'

ঘটনার এই সাঙ্ঘাতিক পরিস্থিতিতে তখনকার মত গোলমাল হয়ে সভা ভেঙে গেল। গোপনে পরামর্শ করবার জন্য ঠিক হল খানিক বাদে সর্দারের

ঘরে নারা ও কয়েকজন পাটকিলেদের নেতা মিলিত হবে। খানিকক্ষণের জন্যে সেই রহস্যময় কৌটোর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। নারাকে এবার একলা পেয়ে কৌটো ও কাগজটি আমি তাকে দেখলাম। নারা নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরেই কৌটোটা খুলেছিল কিন্তু কাগজটুকুর ওপর চোখ দিয়ে সেও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী নারা।'

নারা গম্ভীর স্বরে বললে, 'ব্যাপার গুরুতর! শুধু মিঙ নয়, এই ডুবো-জাহাজে নিলাঙের আরো গুপ্তচর আছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'বুঝলাম এই চিঠি থেকে। যে কারণেই হোক এই গুপ্তচর তোমার ও আমার ওপর একটু সদয়। সে তাই আমাদের বাঁচাতে চায়।'

কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠিতে কী লিখেছে?'

নারা চিঠিটা পড়ে শোনালো। চিঠির ভাষা এইরকম—'নিলাঙের দেবতা তোমাদের দুজনকে রক্ষা করতে চান। পাটকিলেদের সর্বনাশ আসন্ন। তাদের শীঘ্র ত্যাগ কর। —তোমাদের বন্ধু।'

এই ডুবো-জাহাজের ঘাঁটিতে নিলাঙের গুপ্তচর আছে! কথাটা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষত সেই গুপ্তচর এত লোক থাকতে শুধু আমাদের দুজনেরই শুভাকাঙ্খী কেন যে হল তার কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না।

নারা কিন্তু ব্যাপারটার অপর একদিকের কথা ভাবছিল। এই ঘাঁটিতে গুপ্তচর কতদিন ধরে প্রবেশ করেছে কে জানে? এতদিনে এখানকার কোন গোপন সংবাদ সে যে জেনেছে তাও বলা যায় না। এর মধ্যে নিলাঙে যে-সমস্ত সংবাদ সে যে পৌঁছে দেয় নি, তারই বা নিশ্চয়তা কী? আমরা যখন দুজন শাদা-পোশাকীর সঙ্গে মিঙকে ধরে আমাদের গোপন ঘাঁটির খবর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি, তখন শাদা-পোশাকীরা হয়ত সমস্ত খোঁজ-খবর পেয়ে ডুবে-জাহাজের ঘাঁটি আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে।

নারা চিঠির টুকরোটুকু হাতে নিয়ে গভীরভাবে খানিক চিন্তা করে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'উঠলে যে বড়?'

নারাউত্তেজিতভাবেবললে, 'এখুনি একবার সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'গুপ্তচর ধরবার জন্য?'

নারা হতাশভাবে বললে, গুপ্তচর যে কে, এত লোকের মাঝখান থেকে তা বোঝা অসম্ভব। বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানকার পাটকিলেদের সঙ্গে সে বেশ

পরিষ্কারভাবে মিশে গেছে। গুপ্তচর বার করতে গিয়ে কোন নিরীহ লোকের উপরই হয়ত অত্যাচার হবে।'

'তাহলে সর্দারের সঙ্গে কেন দেখা করতে চাও?' জিজ্ঞাসা করলাম।

নারা বললে, 'এখুনি আমাদের সমস্ত পূর্বের প্ল্যান বদলে ফেলা দরকার। জাহাজ-ঘাঁটিতে গুপ্তচর আছে জানবার পর আর আমরা নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারি না। কে জানে নিলাঙের দল এতক্ষণে কী করে বসেছে!'

সর্দারের ঘরে পাটকিলেদের গোপন আড্ডায় যেতে আমার একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল কিন্তু নারা আমায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল।

আমাদের ঘর থেকে সর্দারের কুঠুরিতে যাবার পথে দেখলাম পাটকিলেরা নানা জায়গায় জড় হয়ে উত্তেজিতভাবে মিঙের অন্তর্ধানের ব্যাপারই আলোচনা করেছে। মিঙের খোঁজ না পাওয়াতেই তারা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মনে হল নতুন গুপ্তচরের কথাটা জানলে না জানি তাদের ভেতর কী আতঙ্কের সঞ্চারই হত!

একটি দলের মাঝখানে মুখ-কাটা সেই পাটকিলেটিকেও দেখলাম। উত্তেজিত কণ্ঠে সে চারিধারের লোকদের কি যেন বোঝাচ্ছিল, আমাদের দেখেই লোকটা চুপ করে গেল। সেদিকে আর না চাইলেও বুঝতে পারছিলাম, তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমায় বরাবর অনুসরণ করেছে। এই লোকটির রহস্যও আমার কাছে মিঙের অন্তর্ধানের মতই দুর্বোধ্য। কিন্তু আমার সন্দেহের কথা নারাকে বলবার তখন সময় নেই।

সর্দারের ঘরে ইতিমধ্যেই জন-চারেক পাটকিলেদের নেতা সমবেত হয়েছে। নারা গিয়ে তাদের গুপ্তচরের সংবাদ দেওয়া-মাত্র তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। সর্দার ব্যাকুলভাবে বললে, 'মিঙের অন্তর্ধানেই ভয় পাচ্ছিলাম—আমাদের ঘাঁটিতে আবার গুপ্তচর! তাহলে আমাদের সমস্ত মতলবই এতদিনে নিলাঙ জেনে ফেলেছে!'

আর-একজন নেতা বললে, 'আমাদের নিলাঙ আক্রমণের সময়কার সমস্ত প্ল্যানও যে আজ প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে!

'এখন কী উপায়?' সর্দার নারার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

নারা ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে বললে, 'আক্রমণের পন্থা আমরা বেশি বদলাতে পারব না, কিন্তু সময় আমাদের বদলাতে হবে। গুপ্তচরের কাছ থেকে শাদা-পোশাকীরা সংবাদ যা কিছু পেয়েছে তার সুবিধে যেন তারা না নিতে পারে। আমাদের আর এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই।'

এবার নেতাদের কথা থেকে পাটকিলেদের নিলাঙ আক্রমণের পদ্ধতি আমি

জানতে পারলাম। সে পদ্ধতি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে সে প্রশংসা পাবার যোগ্য। সংখ্যায় এবং অস্ত্রে-শস্ত্রে পাটকিলেরা শাদা-পোশাকীদের কাছে নগণ্য। সেই বুঝেই নিলাঙের দলকে কাবু করবার অদ্ভুত এক উপায় এরা আবিষ্কার করেছে। একদল পাটকিলে নিলাঙের প্রধান গুহা মুখ সামনাসামনি আক্রমণের জন্যে এখান থেকে বেরুবে এবং নিলাঙের লোকদের দৃষ্টি যখন সেইদিকে নিবদ্ধ সেই সময় কয়েকজন বাছাই পাটকিলে যোদ্ধা অতর্কিত হানা দেবে নিলাঙের নকল হাওয়ার কারখানায়। সেই নকল হাওয়ার কারখানা একবার অধিকার করতে পারলেই সমস্ত নিলাঙ পাটকিলেদের বশ্যতা মানতে বাধ্য।

পাটকিলেদের এই আক্রমণের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল আগামী জোয়ারের মাঝামাঝি সময়। জলের রাজ্যের সময় এই জোয়ার দিয়েই নির্দিষ্ট হয় এতদিনে জানতে পেরেছি। এই জোয়ার সমুদ্রের নিচের জলের মৃদু একরকম আলোড়ন মাত্র। আমাদের পৃথিবীর সময়ের আনুমানিক বিশ ঘণ্টা অন্তর এই আলোড়ন এখানে হয়। নিলাঙের দিনের পরিমাণ এই বিশ ঘণ্টাই হলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাদের বৎসর আমাদের মতই পৃথিবীর সম্পূর্ণ সূর্য-প্রদক্ষিণের হিসেবে গণনা করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, এই জাতি যখন পৃথিবীর ওপরে বাস করত তখনকার জ্যোতিষ-গণনাই এখনও এখানে টিকে আছে। বৎসরে দুবার নিজেদের গণনা মেলাবার জন্যে সূর্য-তারকার অবস্থান জানতে এখানকার জ্যোতিষীরা সমুদ্রের ওপর যন্ত্রযানে করে ওঠে। বাইরের আকাশের সঙ্গে এ রাজ্যের লোকের এই দুবারই মাত্র দেখা হয়। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত জ্যোতিষীদের এমনি এক গণনার সময়ের সঙ্গেই আমাদের জাহাজ-ডুবির সময় যে মিলে গেছল এবং সেইজন্যেই আমাদের জাহাজ ফুটো হয়ে যেমন ডুবেছিল তেমনি যে আমরা যন্ত্রযানের মুক্ত খোলে আশ্রয়ও পেয়েছিলাম, এ কথা এতক্ষণে নিশ্চয় বোঝা গেছে। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ-জহাজ থেকে সাগরের মাঝে অদ্ভুত গম্বুজ দেখতে পাওয়ার রহস্যেরও এই এক ব্যাখ্যা।

নারা আগামী জোয়ারের বদলে এই জোয়ারেই নিলাঙ আক্রমণের পরামর্শ দিলে। তার মত এই যে এইভাবে অতর্কিত আক্রমণ করলে গুপ্তচরের সংবাদ শাদা-পোশাকীদের আর কোন কাজে লাগবে না।

সর্দার একটু আপত্তি জানিয়ে, বললেন, 'কিন্তু আমরা যে এখনো সম্পূর্ণ প্রস্তুত হই নি '

নারা একটু রেগেই জবাব দিল যে শাদা-পোশাকীরা প্রস্তুত হবার সময় পেলে আমাদের প্রস্তুত হওয়ার কোন দামই যে থাকবে না!

সর্দার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমরা সবাই চমকে উঠলাম! সমস্ত

জাহাজ-ঘাঁটিটা ভীষণভাবে হঠাৎ দুলে উঠেছে। আমরা সবাই কাত হয়ে পড়েছিলাম। ঘরের জিনিসপত্রগুলোও ছিটকে পড়ে গেছল। স্থির অটল জাহাজটা কি কারণে এখন দুলে উঠল বুঝতে না পেরে আমি প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেছলাম। প্রথম দোলার পর জাহাজটা এখনও কিসের ঘায়ে যেন কাঁপছিল। আমি সবিস্ময়ে সকলের দিকে চেয়ে দেখলাম, পাটকিলে নেতারাও বেশ একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের সকলের মনেই প্রথমটা বোধহয় একই ভয় জেগেছিল—নিলাঙের দল জাহাজঘাঁটি আক্রমণ করেছে। কিন্তু জাহাজটা কাঁপতে থাকলেও সেরকমভাবে অনেকক্ষণ আর না দোলাতে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। সর্দার ঘণ্টা বাজিয়ে বাইরের প্রহরীদের ব্যাপার জানবার জন্যে তলব করলে। নারাই প্রথম একটু হেসে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললে, 'ও বিশেষ কিছু নয়, কাছেই কোথাও সমুদ্রের তলায় কম্পন হয়েছে।'

প্রহরী এসে যা জানালে তাতে নারার অনুমানই সত্য বলে প্রমাণ হল বটে, কিন্তু নারা ব্যাপারটাকে যতখানি হাল্কা করে বলেছিল ব্যাপারটা শোনা গেল তত হাল্কা নয়।

বহুক্ষণ আগেই নাকি বাইরের জলের আলোড়ন অসাধারণভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই কম্পনের সঙ্গে জলের স্রোত আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। জাহাজটা সেই জলের প্রবল বেগেই এ-রকমভাবে কাঁপছে।

নারার কাছ থেকে জানলাম যে এ রাজ্যে জলের এ রকম বেগ মাঝে মাঝে বাড়ে। ব্যাপারটাকে জলের একরকম ঝড় বলা যেতে পারে। সমুদ্র-তলের কোন সুদূর প্রদেশ থেকে সেই সময় প্রচণ্ড বেগে জলের বিপুল স্রোত বয়ে আসে। জলজ গাছপালা, নানাপ্রকার প্রাণী অসহায়ভাবে সে স্রোতে ভেসে যায়। অনেক প্রাণী মারা যায়, গাছপালা সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সমুদ্রের তলার ভূমিকম্পের সঙ্গে নাকি এই জলের ঝড়ের বিশেষ যোগ আছে। বহুদিন আগে একবার এমনি ঝড়ে নাকি নিলাঙের সমস্ত মানুষের জাত লোপ হবার উপক্রম হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। সুখের বিষয় মাঝে মাঝে সামান্য একটু-আধটু জলের স্রোত বাড়লেও সেরকম ঝড় বড়-একটা হয় না।

আমাদের আলোড়নটা কিন্তু নিতান্ত সাধারণ নয়। ডুবো-জাহাজটা ক্রমশই যেন আরো জোরে কাঁপছিল। সর্দার চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নি, তার ওপর জলের এই প্রবল স্রোতের ভেতর আক্রমণ করা কি উচিত হবে?'

নারা বললে, 'এই তো আমাদের সত্যকার সুযোগ! আজ নিলাঙের

পাহারা তেমন কড়া থাকবে না। জলের এই প্রবল স্রোতের ভেতর আমরা অনায়াসে শাদা-পোশাকীদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারব।'

পাটকিলেদের শৃঙ্খলা ও কাজ করবার শক্তি সত্যি প্রশংসনীয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

পাম্প-ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে প্রথম পা দিয়ে আমি কিন্তু চমকে উঠলাম। ঘাঁটির ভেতর থেকে বাইরের অবস্থা কিছুই কল্পনা করতে পারি নি। সমুদ্র-তলের জল-বাত্যা এমন জিনিস কে জানত। স্রোতের অসম্ভব টানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একরকম অসম্ভব। তার উপর প্রতি মুহূর্তে ছেঁড়া জলজ জঙ্গলের গাছপালা গায়ের ওপর প্রবল বেগে আছড়ে এসে পড়েছে, নানারকমের মাছ এর মধ্যেই ভীত হয়ে বিদ্যুৎগতিতে চারিধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাইরের গোটাকতক সার্চলাইট জাহাজ-ঘাঁটির গায়ে জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ছিন্ন গাছপালা-সমেত সমুদ্র-তলের কাদায় স্রোতের জল এমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে যে সে আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় না।

আমরা যন্ত্রযানেই কজন যাব বলে ঠিক হয়েছিল। জাহাজ থেকে আমাদের যন্ত্রযান সামান্য একটু পথ। কিন্তু স্রোতের টান সামলে সেইটুকু যেতেই যেন প্রাণান্ত হয়ে গেল। সবচেয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল একটা অস্বাভাবিক তাপে। এখানকার সমুদ্র-তলের জলের তাপ সাধারণত আমাদের রক্তের তাপের সমান। অন্যান্য সময়ে সে জলে কোন অসুবিধেই হয় না, কিন্তু আজ কেন যে তার তাপ হঠাৎ এতটা বেড়ে গেছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হামাগুড়ি দিয়ে দু-হাত দু-পায়ে মাটি আঁকড়ে কোনরকমে এগুতে এগুতে শুধু এই ভাবনা ভেবেই অবাক হচ্ছিলাম যে এই জলের দুর্যোগের ভেতর কী করে পাটকিলেরা তাদের আক্রমণের পদ্ধতি ঠিক রাখবে।

শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কাই সত্য হল। জলের টানে আমাদের যন্ত্রযান একধারে কাত হয়ে গেছল। নোঙর তখন ভীষণভাবে টান পড়েছে। কোন-রকমে আমরা পাম্প-ঘর দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নোঙর গেল ছিঁড়ে। তখন ডুবো-জাহাজের সঙ্গে যন্ত্রযানের ধাক্কা লাগে আর কি! নারা অসীম কৌশলে সে টাল সামলালে, কিন্তু যন্ত্রযান যখন নিরাপদ জায়গায় এল তখন দেখা গেল আর সকলের থেকে আমরা আলাদা হয়ে গেছি। জলের স্রোতে জায়গা ঠিক না রাখতে পেরে আমাদের সঙ্গীরা কোথায় যে গেছে কিছুই বলা যায় না।

ছাব্বিশ

স্রোত ক্রমশই যে আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রযানের পেরিস্কোপে দেখতে পাচ্ছিলাম অসংখ্য জলজ প্রাণীর ঝাঁক আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে সেই তপ্ত জলের স্রোত ছাড়িয়ে ছুটে পালাবার বৃথা চেষ্টা করছে। এত জলজ প্রাণী এর আগে কোথায় যে ছিল কে জানে! পঙ্গপালে যেমন পৃথিবীর আকাশ ছেয়ে যায় তেমনি সমস্ত জল তাদের ভিড়ে অন্ধকার হয়ে গেছল। খাদ্য-খাদক, শিকার-শিকারী সকল জাতের মাছ ও প্রাণী একসঙ্গে তার ভেতর ঠেলাঠেলি করছে। অসহায় আতঙ্ক ছাড়া আর কোন প্রেরণা তাদের নেই।

জলজ উদ্ভিদের ছিন্ন অংশ আমাদের যন্ত্রযানের প্যাডেলে জড়িয়ে গিয়ে গোড়া থেকেই আমাদের গতি ব্যাহত হচ্ছিল। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে জলজ প্রাণীদের দেহ লেগে যেকোন মূহূর্তে প্যাডল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

নারা উৎকণ্ঠিত মুখে বললে, 'স্রোতটা যেন বড্ড বেশি বলে মনে হচ্ছে।'

সদার বললেন, আমাদের সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে বোধহয়। এই স্রোতের ভেতর আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখা যাবে কী করে! আর যদি বা ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারি, যন্ত্রযান থামানো তো যাবে না! থামাবার আগেই স্রোতের টানে পাহাড়ে আছড়ে পড়বে যে!'

নারা ভয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমাদের সঙ্গীরা এই দুর্যোগে কী করেছে কে জানে? তারা পথ ঠিক করতে পারবে তো!'

গোলমালের ভেতর কে কে আমরা যন্ত্রযানে এসে উঠেছি এতক্ষণ লক্ষ করি নি। একজনের গলার স্বরে চমকে এবার চেয়ে দেখলাম, মুখ-কাটা সেই পাটকিলেও আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে অদ্ভুতভাবে হেসে বলছিল, 'অত খোঁজা দূরের কথা, তারা প্রাণে বাঁচলে হয়।'

এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভেতর পাটকিলেদের নিলাঙ আক্রমণে বেরুনোটা যে ভাল হয় নি, মনে মনে সবাই এবার তা বুঝেছিল। তবে জলের আলোড়ন এত ভয়ঙ্করই যে হয়ে উঠবে তা কেউ আর কল্পনা করতে পারে নি।

যাই হোক, মুখ-কাটা পাটকিলের হাসিটা অত্যন্ত খারাপ লাগল!

সর্দার বললেন, 'এবারের সামুদ্রিক ভূমিকম্পটা সাজ্যাতিক রকমের হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নিলাঙের ক্ষতি হবে ভয়ানক বেশি!'

মুখ-কাটা পাটকিলে বললে, 'আমরা তো তাই চাই!'

নারা একটু রেগে বললে, 'তুমি ভুল করছ, তা আমরা মোটেই চাই না।

আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা চাই মাত্র, কিন্তু সমস্ত নিলাঙের সর্বনাশ হোক এ আমরা কখনও কামনা করি না। তাতে আমাদেরই ক্ষতি।'

সর্দার সে কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'এই দুর্ঘটনায় আমাদের তেলের ঘাঁটির সমস্ত কল-কব্জা নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের আহার্য মাছের ঝাঁক অধিকাংশ মারা যাবে—কিছু বা ছত্রভঙ্গ হয়ে এ তল্লাট ছেড়ে যাবে; শুধু তাই নয় আমাদের সমুদ্রের সমস্ত দাবি অরণ্য একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। আমি তো দেখছি নিলাঙে এবার ভীষণ অন্নাভাব হবে। শাদা, পাটকিলে কারুর এ থেকে রেহাই নেই।' মুখ-কাটা লোকটা এবার আর কোন কথা বললে না।

কথা কইতে কইতে আমাদের যন্ত্রযান প্রবল বেগে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছিল। যন্ত্রযানের যত না গতি, স্রোতের টানে তার চেয়ে বেশি জোরে সে চলছিল। পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা একটা প্রলয় কাণ্ডের মাঝখান দিয়ে উল্কার মত যেন ছুটে চলেছি। যে সমস্ত জানোয়ার এখানকার লোকেরাও খুব কম দেখতে পায়, গহন জলজ অরণ্যের আশ্রয় ত্যাগ করে তারাও ভীতভাবে আজ বেরিয়ে এসেছে। বিশালকায় ভয়ঙ্কর আকৃতির সমস্ত প্রাণী প্রায়ই আমাদের যন্ত্রযানের আশ-পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে। তাদের অনেকেই স্বয়ংপ্রভ। ঘোলাটে জলেও তাদের রোশনাই দেখা যাচ্ছিল।

নারা-ই যন্ত্রযানের গতি নিয়ন্ত্রিত করছিল বা করতে চেষ্টা করছিল। পেরিস্কোপের দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে সে এবার সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলে, 'নিলাঙের হাওয়া-কলের মহলের দিকেই তো যেতে হবে?'

সর্দার হতাশভাবে বললেন, 'সেই রকমই তো মতলব ছিল। কথা ছিল যে সদর দরজায় আমাদের দলের অন্যান্য যোদ্ধারা গিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে নিলাঙের লোকের চোখে ধাঁধা দেবে, আর সেই সুযোগে আমরা যন্ত্রযান নিয়ে হাওয়া-কলের মহলে ঢুকে পড়ব! কিন্তু এই দুর্যোগে আমাদের লোকেরা সদর-পথে কি পৌছতে পারবে?'

নারা বললে, 'না পারলেও ক্ষতি নেই। আজকে নিলাঙের লোকরা এই জলের বিপদ নিয়েই এত ব্যস্ত থাকবে যে হাওয়া-কলের মহল পাহারার কথা তাদের মনেই থাকবে না।'

সর্দার চুপ করে রইল। নারা আবার বললে, 'কিন্তু আমি ভাবছি যদি-বা এই স্রোতের ধাক্কা সামলে যন্ত্রযান থামানো যায়, হাওয়া-কলের গোপন দরজা চেনাবে কে!'

সর্দার একটু হেসে বললেন, 'যন্ত্রযান যদি তুমি থামাতে পার তাহলে সে

ভাবনা নেই।' তারপর মুখ-কাটা সেই পাটকিলেটাকে দেখিয়ে বললেন, 'সে ভার নিয়েছে স্বয়ং এই চিনম্।'

এতক্ষণে মুখ-কাটা লোকটার আমাদের সঙ্গে আসবার উদ্দেশ্য বুঝলাম। কিন্তু তবু আমার মনের ভেতরকার ভয় তেমন গেল না।

নারা কোন কথা আর না বলে আবার স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছিল। আমরা এইবার নিলাঙের ঠিক ওপর এসে পড়েছি বুঝতে পারছিলাম। নিচে পাহাড় না দেখা গেলেও বাধা পেয়ে স্রোত এখানে যে রকম উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বার হয়ে উঠেছিল তা থেকেই পাহাড়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নারা যন্ত্রযানকে যথাস্থানে নামাবার খানিকক্ষণ অমানুষিক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে বললে, 'না, হবে না, এখানে যন্ত্রযান নামাতে গেলে আমরা সবশুদ্ধ পাহাড়ে আছড়ে ধুলো হয়ে যাব!'

সর্দার হতাশভাবে বললেন, 'তাহলে উপায়? এখন তো ফেরাও যায় না। তা ছাড়া এই প্রলয়-কাণ্ডের ভেতর আমাদের জাহাজ-ঘাঁটিও কি এতক্ষণ টিকে আছে।'

নারা চুপ করে রইল। আমি তো হতাশভাবে শেষ সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছিলাম। হঠাৎ সেই মুখ-কাটা চিনম্ এগিয়ে এসে বললে, 'আমি এক উপায় বাৎলাতে পারি!'

উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলে বললে, 'কী?'

চিনম্ বললে, 'নিলাঙের এধারে স্রোত যখন প্রবল তখন ওধারে পাহাড়ের পেছনে জল নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত শান্ত হতে বাধ্য। সেখানে যদি কোনরকমে যন্ত্রযান নিয়ে যেতে পারা যায়—'

নারা তার কথা শেষ না হতেই বললে, 'তাতেই বা কী হবে! আমরা কি শুধু প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত?'

চিনম্ কথায় বাধা পেলেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্তভাবে বললে, 'সেখানকার একটি গুপ্ত পথ আমি জানি। তা দিয়েও অনায়াসে আমরা হাওয়া-মহলে পৌঁছতে পারব।'

চিনমের কথা মিথ্যে নয়। এধারের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জলের স্রোত নিলাঙের ওপর দিয়ে এমনভাবে বয়ে যাচ্ছে যে তার পেছনের দিকে নিচের জল অনেকটা শান্ত। সেই অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে কোনরকমে নারা তার যন্ত্রযান থামালে।

চিনমের সঙ্গে গুপ্ত পাম্প-ঘর দিয়ে আমরা সকলে নিলাঙের ভেতরে প্রবেশ

করলাম। যে নিলাঙ থেকে শরৎকে হারিয়ে একদিন অদ্ভুতভাবে বিদায় নিয়েছিলাম, তার পাষাণপুরীতে এতদিন বাদে প্রবেশ করে আমার মনের অবস্থা কী যে হল তা বর্ণনা করা কঠিন। নিজের মনের ভাবনা নিয়ে তখন থাকবারও কিন্তু সময় নেই। গুপ্ত পথ দিয়ে সন্তর্পণে সকলে তখন হাওয়া-মহলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকের সুড়ঙ্গ-পথগুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। একজনের বেশি দুজন পাশাপাশি যাওয়া যায় না। জটিলও অত্যন্ত বেশি; একটু না যেতে যেতেই দেখা যায় পথ নানা জায়গায় বিভক্ত হয়ে গেছে। চিনম্-এর এই মহলের সঙ্গে পরিচয় নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশি। অতি সহজেই সে নিজের রাস্তা বেছে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। আমরা তাকেই অনুসরণ করে চলেছিলাম।

এ পথটি গুপ্ত বলেই হোক বা আজকের দিনে নিলাঙের লোক অন্য দিকে ব্যস্ত থাকার দরুনই হোক, বাধা আমরা কোথাও পেলাম না। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পার হয়ে এসে প্রায় এক ঘণ্টা বাদে এক জায়গায় এসে চিনম্ থামল। সেখানে পথ প্রশস্ত হয়ে দুটি বৃহদাকার কামরার দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। একটি ঘরের দরজায় চামড়ার মত পুরু কি একটা জিনিসের বিশাল পর্দা দেওয়া সেই পর্দার দিকে দেখিয়ে চিনম্ বললে, 'এই হাওয়া-কলের দরজা।'

তার মুখে সার্থকতার উল্লাস পরিস্ফুট। এত দূর বিনা বাধায় এত বিপদ অতিক্রম করে আসতে পেরে নারা ও সর্দারও তখন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তারা একটু দ্রুতপদেই সেই পর্দার দিকে অগ্রসর হল। আমিও পেছু নিলাম। কিন্তু এক পা-র বেশি আর অগ্রসর হতে হল না।

সেইমুহূর্তে সেই পর্দার আড়াল থেকে জন-পাঁচেক শাদা-পোশাকী বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেললে, আমাদের চক্ষের পলক ফেলবার অবসর পর্যন্ত তারা দিলে না।

পেছনে চেয়ে দেখি চিনম্ আমাদের দিকে চেয়ে তার কাটা-মুখে বীভৎস-ভাবে হাসছে।

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে বুঝতে আমাদের কিছুক্ষণ সময় গেল। কিন্তু চিনম্ আমাদের সঙ্গে কতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা বোঝবার পর নারা ও সর্দার একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আস্ফালন আমাদের তখন নিষ্ফল, তা ছাড়া চিনম্-এর পরিচয় তখনও আমরা পাইনি।

আমাদের একজন প্রহরী চিনম্-এর দিকে চেয়ে কি জিজ্ঞাসা করলে। চিনম্ তার উত্তরে তার বাঁ হাতের কব্জির ওপর থেকে পুরু চামড়ার আঁট জামাটা একটু সরিয়ে ফেললে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিস্মিত হয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম।

নারা ব্যাপারটা লক্ষ করে নি, জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে ?'

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, 'এই মিঙ !'

'মিঙ ?'

'হ্যাঁ, চিনম্‌ই মিঙ।'

চিনম্-এর হাতের কব্জিতে বোতাম-বসানো সেই তাবিজটি তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নারা ও সর্দার সেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যে মিঙকে খোঁজবার জন্যে আমরা জাহাজ-ঘাটির বাইরের সমস্ত জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলেছিলাম, সে যে নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ-ঘাঁটির ভেতরেই অন্য ছদ্মবেশে তখন লুকিয়ে ছিল কে ভাবতে পেরেছিল! সত্যিই বিস্ময়ের কথা।

মিঙ যেন আমাদের আরো হাস্যাস্পদ করবার জন্যে মুখের ওপরকার কি একটা জিনিস কানের পাশ দিয়ে খুলে ফেললে। দেখলাম সেটা নকল পাতলা চামড়ার একরকম অদ্ভুত মুখোস। সেইটের জন্যেই তার মুখটাকে অমন কাটা দেখাচ্ছিল।

রাগে সর্বাঙ্গ জলে গেলেও মিঙের এ বাহাদুরিতে তার প্রশংসা না করেও পারছিলাম না। আমাদের সকলের চক্ষে এমনভাবে ধুলো দেওয়া কম বাহাদুরি নয়।

জাহাজ-ঘাঁটিতে কে যে আমাদের সাবধান করে চিঠি দিয়েছিল, কেন যে আমার দিকে মুখ-কাটা চিনম্ অমন রহস্যজনকভাবে চাইত—সমস্ত সমস্যারই এবার মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু মীমাংসা হল বড় দেরিতে। আমরা এখন মিঙের কৌশলে শাদা-পোশাকীদের বন্দী। নিলাঙ আক্রমণ করতে এসে আমরা নিশ্চিন্ত মনে তারই তৈরি ফাঁদে পা দিয়ে বসেছি।

প্রহরীরা মিঙের আদেশে আমাদের সকলকে একদিকে এবার নিয়ে চলল। আবার বহু সুড়ঙ্গ পথ পার হয়ে আমরা নিলাঙের কয়েদে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমার বিশ্বাস ছিল আমাকেও এরা নারা ও সর্দারের সঙ্গে একই কয়েদে রাখবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জেলখানার দরজা খোলার পর নারা ও সর্দারের অনুসরণ করে আমি যখন সেখানে ঢুকতে যাব তখন হঠাৎ মিঙ পেছন থেকে আমার জামা ধরে আমায় নিরস্ত করলে। আমি অবাক হয়ে পেছন ফিরে চাইতেই সে বললে, 'তোমার জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত।'

আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ?'

'নিলাঙের দেবতার হুকুম !'

নিলাঙের দেবতাকে মনে মনে অভিসম্পাত করে ফিরে তাকাতেই আমি দেখি, নারা সর্দারকে ভেতরে পুরে জেলখানার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে এবার মিঙের দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'নিলাঙের দেবতা আমায় নিয়ে এবার কী করতে বলেছেন ?' যে নারার সঙ্গে সুখে-দুঃখে আমার এতদিন কেটেছে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যি আমার অত্যন্ত দুঃখ ও রাগ হচ্ছিল। শরৎকে তো হারিয়েছি আগেই। এর পর নারাকে হারাতে আর আমার ইচ্ছে ছিল না। যদি কোন বিপদ তার ঘটে—আমার মনের বাসনা ছিল সে বিপদের পুরো ভাগ নেওয়া। কিন্তু তা হল না।

মিঙ বললে, 'আমার সঙ্গে যেতে হবে।' তার আদেশের ভেতরেও কেমন একটু সম্ভ্রমের সুর পেয়ে আমি অবাক হলাম। তবু ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের দেবতার কাছে ?'

মিঙ মাথা নেড়ে জানালে, 'হুঁ।'

মিঙের সঙ্গে যেতে যেতে সত্যই নিলাঙের অদ্ভুত দেবতার আমাকে কী দরকার হল ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। নিলাঙের দেবতাটি কী চীজ তাও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের নিলাঙ কি এই দেবতার আদেশেই চলে নাকি ?'

মিঙ সংক্ষিপ্তভাবে জানালে, 'আজকাল চলে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আজকাল মানে ? আগে কি তিনি ছিলেন না নাকি ?'

'ছিলেন, তবে দেখা দেন নি।'

দেবতার রহস্য ক্রমশই গভীর হচ্ছিল। মিঙ যখন আমাকে নিয়ে নিলাঙের বিশাল একটি অলঙ্কৃত হল-ঘরে প্রবেশ করলে, তখন মনে সত্যই একটু ভয়-মিশ্রিত বিস্ময় জাগছে। কী না জানি দেখব কে জানে।

হল-ঘরটি পাথর কেটে তৈরি প্রকাণ্ড একটা মন্দির-চত্বরের মত। চারিধারে অলঙ্কৃত সব থাম, তাতে অদ্ভুত সব কারুকার্য। প্রত্যেক থামের ওপর অপরূপ রঙের সব আচ্ছাদিত আলো জ্বলছে। দূরে একটি পাথরের প্রকাণ্ড মঞ্চ। সেখানকার কারুকার্য অদ্ভুত। নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর চেহারার নকলে সেখানে নানা রকমের পাথরের নক্সা। মঞ্চের চারিধারে বহু শাদা-পোশাকী নত মস্তকে বসে আছে। মাঝখানে সমস্ত মুখ রুপোর মত চক্‌চকে একরকম ঝালরে ঢেকে, মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট দিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি আসনে একটি লোক বসে আছে। আমাদের পৃথিবীর ওপরকার কাপড়ের মত একরকম জিনিসে তার সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত। ওপর থেকে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো তার সে দেহে ও মুখের ওপর পড়ে ঝলমল করে উঠছে।

এগুতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই কি নিলাঙের দেবতা! জীবিত দেবতা আবার কি রকম!

পেছন থেকে মিঙ ঠেলা দিয়ে বললে, 'চল।'

সমস্ত চত্বর পার হয়ে একেবারে সেই উঁচু আসনের কাছে মিঙ আমায় থামতে বললে।

হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মিঙ আমায় টেনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে বললে, 'দেবতার সম্মান জান না!

বসে পড়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি দেবতার দিকে চাইলাম। ঘন রুপোলি ঝালোরের ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। দেবতা আমার আগমনে প্রসন্ন কি রুষ্ট কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু তিনি হাতের একটি দণ্ডের মত জিনিস তুলে ধরলেন—এইটুকু দেখলাম।

সেই মুহূর্তে মঞ্চের পেছনের একটি পাথরের ছোট দরজা খুলে গেল। অন্যান্য শাদা-পোশাকীরা দেখলাম এখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে উঠেছে। দেবতাও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমায় অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে সেই দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

এতক্ষণে সত্যি আমার অত্যন্ত ভয় করছিল। সাধারণ বিপদে আমি কাতর নই, কিন্তু ভুতুড়ে দৈব ব্যাপার আমার কেমন খারাপ লাগছিল। ঝালর-মুখো ঐ দেবতার সঙ্গে পাথরের এই দরজার পেছনে যেতে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ হল না। মিঙ ও দুজন শাদা-পোশাকী প্রহরী আমায় পেছন থেকে ঠেলা সত্ত্বেও আমি একরকম মাটি কামড়ে সেইখানেই পড়ে রইলাম।

কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে আমি পারব কেন! তারা দেবতার পেছু পেছু আমায় একরকম কাঁধে ধরে ঝুলিয়েই নিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে তবু আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলাম। ঝাঁকানি দিয়ে প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে আমি আর-একটু হলেই বোধহয় পেছন দিকে লাফ দিয়ে পড়তাম।

হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় দেবতা বললেন, 'ভয় নেই!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাংলা শুনে আমি স্তম্ভিত হই নি। হয়েছিলাম শরতের গলা শুনে।

নিলাঙের দেবতা শরৎ!

আটাশ

দেবতার একটি শব্দে আমার অত বড় পরিবর্তন লক্ষ করে, শাদা-পোশাকীদের তাদের দেবতার ওপর শ্রদ্ধা বোধহয় অত্যন্ত বেড়ে গেছল।

খানিক নিস্তব্ধ থেকে আমি এবার বিনা প্রতিবাদে পাথরের দরজা দিয়ে

ভেতরে প্রবেশ করলাম দেবতার পেছু পেছু। পরমুহূর্তেই পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ছোট সঙ্কীর্ণ ঘর, কিন্তু ঐশ্চর্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু তখন সে ঐশ্বর্য আমার চোখে পড়ে নি। আমি অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে তখন তাকিয়ে আছি।

ঘরে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। শরৎ ধীরে ধীরে মুখের ঝালর-সমেত তার মাথার মুকুট খুলে ফেললে। আমি আর থাকতে না পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললাম, 'শরৎ' তুই বেঁচে আছিস!'

শরৎ একটু হেসে বললে, 'বেঁচে আছি মানে? নিলাঙের দেবতা কি শুধু বেঁচে আছে?'

আমি একটু দূরে সরে তার দিকে ভাল করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমি যে সত্যিই আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না!'

শরৎ তেমনি পরিহাসের স্বরে বললে, 'নিলাঙে এতদিন বাস করে এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করিস নাকি।'

'ঠাট্টা নয়' ব্যাপারটা কী বল্ দেখি!'

শরৎ আমার কাঁধ ধরে একটি আসনে বসিয়ে বললে, 'বলছি, আগে একটু জিরিয়ে নে। নিলাঙ আক্রমণ করে হাঁপিয়ে পড়েছিস যে!'

'না ভাই, আমার আর সবুর সইছে না!'

শরৎ বললে, 'তবে শোন্।'

শরৎ তারপর তার দেবতা হওয়ার যে কাহিনী আমায় বললে, তা ঘটনাবহুল না হলেও আমার কাহিনীব চেয়েও বলতে গেলে অদ্ভুত।

সেই নিলাঙ-প্রবেশের প্রথম দিন আমার পেছনে দৌড়ে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় পাশের দেওয়াল ফাঁক হয়ে একটা দরজা তার সামনে বেরিয়ে পড়ে। আমায় ডেকে সেই দরজাটা দেখাতে যাবে, এমন সময় সেখান থেকে কজন শাদা-পোশাকী বেরিয়ে তাকে চক্ষের নিমেষে সেই দরজার ভেতর টেনে নিয়ে যায়। দরজা তার পরেই হয়ে যায় বন্ধ।

শাদা-পোশাকীরা তারপর তাকে জেলখানাতেই নিয়ে যায়। সে ভেবেছিল সেখানে তার ভাগ্যে হয়ত ভয়ঙ্কর শাস্তিই আছে। কিন্তু তার বদলে সেই-খানেতেই তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

পাটকিলেদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধা সত্ত্বেও প্রত্যহ বহু লোক তার অদ্ভুত চেহারা জেলে দেখতে আসত। একদিন এ রাজ্যের এক পুরোহিত তাকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ আহ্লাদে আটখানা হয়ে একেবারে নাচ শুরু করে দেয়। কী যে

হল প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারে নি। পুরোহিতের ডাকে হোমরা-চোমরা অনেক শাদা-পোশাকী এসে তাকে উল্টে-পাল্টে আঙুল, পা, নাক, মুখ এমনভাবে কদিন দেখতে আরম্ভ করে যে তার প্রাণান্ত হবার উপক্রম। শেষকালে তারা তাকে একদিন জেলখানা থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল এই মন্দিরের মাঝখানে। নিলাঙের শাদা-পোশাকীরা সেদিন আসতে কেউ আর বাকী নেই।

সে প্রথম ভেবেছিল বুঝি তাকে নরবলিই দেওয়া হবে এই মন্দিরে, কিন্তু তার বদলে নিজের খাতির দেখে সে অবাক।

সমস্ত ব্যাপারের অর্থ বুঝতে পারল সে অনেক দিন বাদে। তখন পুরোহিতেরা বহু পরিশ্রম করে তাকে এ দেশের সমস্ত ভাষা শিখিয়েছে।

এদের শাস্ত্রে নাকি আছে যে আগে জলের রাজ্যের লোকেরা ছিল পৃথিবীর ওপর। তখন দুই দেবতা-ভাই তাদের ওপর রাজত্ব করত। ঝগড়া করার ফলে এক ভাই তার লোকজন-সমেত এই জলের রাজ্যে নির্বাসিত হয়। শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, পৃথিবীর দেবতা-ভাই যতদিন না জলের রাজ্যে আসবে ততদিন নিলাঙের শাপমুক্তি হবে না। এতদিন বাদে শরৎকে দেখে তারা বুঝেছে যে এই সেই পৃথিবীর ওপরকার দেবতা-ভাই। কারণ শাস্ত্রে যেমনটি লেখা আছে সে সমস্ত লক্ষণ তার আছে। তার হাত-পা জোড়া নয়, তার গলায় নেই কানকো, তার রঙটাও বেশ কটা।

সুতরাং শরৎকে তারা দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করে সমস্ত নিলঙের কাজের ভার তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে শরৎ বললে, 'দেবতা হয়েও আমার কিন্তু ভাই সুখ হল না। তোর খোঁজ না পেয়ে আমি একবারে হতাশ হয়ে পড়েছি তখন। পাটকিলেদের সঙ্গে হাঙ্গামা সত্ত্বেও আমি নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত চর তোর খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়েছিলাম। তারই একজন তোকে খুঁজে এনেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'ভাগীরথী জাহাজের ইউনিফর্মের বোতাম বুঝি তোমার রাজ-চিহ্ন?'

শরৎ হেসে বললে, 'কী আর করি বল, ঠাট তো বজায় রাখতে হবে!'

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, 'কিন্তু একটা যে ভারি মুস্কিল হয়ে গেছে ভাই!'

'কী?' বলে শরৎ উদ্বিগ্নভাবে চাইলে।

নারা আমার কত বড় বন্ধু তাকে বুঝিয়ে আমি বললাম, 'সে আর সর্দার এখানে বন্দী হয়েছে। তাদের কোন ক্ষতি যাতে না হয় তাও করতে হবে।'

শরৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'নকল দেবতা সেজেছি বলে সত্যিই নিলাঙের কল্যাণের কথা কি ভাবি না মনে করিস ভাই? সে আমি ভেবে রেখেছি। নারা কেন, কোন পাটকিলের আর কোন ক্ষতি হবে না।'

'তার মানে?'

'তার মানে, কাল এখানকার সবচেয়ে বড় বিচার-সভা বসবে। এই জলের অস্বাভাবিক আলোড়নে নিলাঙের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হচ্ছে। যে সমস্ত পাটকিলে বিদ্রোহ করেছিল তাদের অনেকে মারা পড়েছে আর বাকীরাসব বন্দী হয়েছে। কাল তাদের বিচার।'

'বিচার কী হবে?'

'ন্যায়-বিচার ছাড়া আর কী হবে! শাদা ও পাটকিলেরা দুই ভাই। এদের পরস্পরের ভেতর বিরোধ যাতে না থাকে—কেউ যাতে কারুর ওপর অবিচার, অন্যায় না করতে পারে তার ব্যবস্থা নিলাঙের দেবতা ছাড়া কে করবে? কালকের বিচার-সভায় আমি পাটকিলে ও শাদাদের ভেদ দূর করে সমস্ত পাটকিলেদের মুক্তি দেব।'

'তুমি দিলেই হবে?' অবস্থার প্রভাব এমনি যে অজান্তে আমারই যেন শরতের ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছিল।

শরৎ হেসে বললে, 'নিলাঙের দেবতার ওপর কথা কইবার কেউ আছে নাকি?'

আমি আশ্বস্ত হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু এইরকম দেবতাগিরিই করতে হবে নাকি এখানে চিরকাল?'

'সবশুদ্ধ পাঁচ বছর তো হবে এখনো।'

'কেন?'

'শাস্ত্রে লেখা আছে— দেবতা পাঁচ বৎসর এদের সঙ্গদান করবেন।'

আমি ভীত হয়ে বললাম, 'পাঁচবৎসর ধরে এইসমুদ্রের তলায়থাকতে হবে!'

শরৎ একটু হেসে বললে, 'আমাদের বুদ্ধিতে যদি ঘুণ ধরে থাকে, আর সাহস যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাই হবে।'

শরতের চোখের ইসারা বুঝে আমিও হাসতে লাগলাম।
